বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের আইন, নীত ও বিধিমালাসমূহের ম্যাপিং, পর্যালোচনা এবং এ খাতে লুণ্ঠনমূলক মূল্যবৃদ্ধি অনুসন্ধানে বিইআরসির আদেশ পর্যালোচনা (২০০৯-২০২১)

ভূমিকা

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে ভোক্তাবান্ধব করে গড়ে তুলতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রণয়ন করা হয়েছে জ্বালানি রূপান্তর নীতি ২০২২। এই নীতির আলোকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের আইন, নীতি ও বিধিমালা পর্যালোচনামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের বিভিন্ন আদেশ পর্যালোচনা করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে লুণ্ঠনমূলক মূল্যবৃদ্ধির বাস্তব চিত্র অনুসন্ধানের কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ভিত্তিতে এই পর্যালোচনা কার্যক্রমের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ২০০৯ থেকে ২০২১ সাল। নিম্নে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

গবেষণার আওতাভুক্ত আইন, নীতিমালা, বিধি ও আদেশসমূহ

আইন	নীতিমালা/বিধিমালা	বিইআরসির আদেশ
১০টি	২৮টি	১০৫টি

গবেষণার আওতাভুক্ত আইনসমূহ ও তার ম্যাপিং

ক্রম	আইনের নাম	ম্যাপিং
১.	বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০	সংশোধনী প্রয়োজন।
২.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ [সংশোধন ২০১৪, ১৮, ২১]	বাতিল করা প্রয়োজন।
৩.	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২	সংশোধনী প্রয়োজন।
৪.	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি আইন, ২০১৩	সংশোধনী প্রয়োজন।
৫.	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫	সংশোধনী প্রয়োজন।
৬.	পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫	পর্যালোচনা প্রয়োজন।

৭.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬	সংশোধনী প্রয়োজন।
৮.	পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬	পর্যালোচনা প্রয়োজন।
৯.	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮	আমূল রূপান্তর প্রয়োজন।
১০.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০, ২০২২	সংশোধন, পুনঃপর্যালোচনা ও আইনের সুরক্ষাকবচ প্রয়োজন।

জ্বালানি রূপান্তর নীতির আলোকে আইনসমূহ পর্যালোচনা ২০০৯-২০২১

নিম্নে এ আইনগুলোর বিদ্যমান ভোক্তাস্বার্থবিরোধী উপাদান এবং ভোক্তাবান্ধব উপাদানের অনুপস্থিতির বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে ভোক্তাস্বার্থ সুরক্ষায় প্রণীত জ্বালানি রূপান্তর নীতি ২০২২-কে নির্দেশক ভূমিকায় রাখা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের আইন পর্যালোচনা ২০০৯-২০২১

ক্রম	আইনের নাম	জ্বালানি রূপান্তর নীতির দিকনির্দেশনা	পর্যালোচনা
১.	বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০	৭.১.১. প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের ১৪৩ ও ১৩ অনুচ্ছেদ মতে জ্বালানি ও জ্বালানিজাত পণ্যের ওপর জনগণের মালিকানা বা স্বত্বাধিকার নিশ্চিত হতে হবে। ৭.২.১. জ্বালানি উৎপাদন, বিতরণ ও বণ্টনে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি ইউটিলিটির পরিচালনা নীতি ও কৌশল সমতাভিত্তিক হতে হবে। ৭.২.৩. জ্বালানি সম্পদ ব্যবহারে সর্বস্তরের মানুষের জন্য সুষম সুযোগ নিশ্চিত হতে হবে।	১. বাংলাদেশ গ্যাস আইনের ভূমিকা ও সংজ্ঞায় এ আইন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বিষয়ে সম্পদের 'সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ', 'রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণ' এবং 'প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির' কথা উল্লেখ থাকলেও গ্যাস সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা ও স্বত্বাধিকার নিশ্চিতকরণের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। ২. আইনের ৭(৩)(ছ) ধারায় বিতরণকারী লাইসেন্সিকে 'গ্যাস বিতরণে ব্যবহারকারীদের মধ্যে অগ্রাধিকারের' প্রয়োজন হলে গ্যাস সংযোগ সীমিত বা সরবরাহ বন্ধের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সর্বস্তরের মানুষের সুষম সুযোগ নিশ্চিত ও সমতাবিধানের কোনো নির্দেশনা উল্লেখ করা হয়নি। ৩. আইনের ৬(১) অনুচ্ছেদে গ্যাস বিতরণে ভোক্তাদের যে শ্রেণীকরণ হয়েছে তা সর্বস্তরের জনগণের সুষম সুযোগ তথা প্রান্তিক ভোক্তার বিশেষ অধিকারকে নিশ্চিত করতে পারেনি। আইনে 'শিল্প' হিসেবে একটি শ্রেণী এবং তাদের জন্য একই সুযোগ নির্দেশ করা হলেও আদতে বৃহৎ শিল্প ও মাঝারি বা ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে বিস্তর

			ব্যবধান। আইনে এই পার্থক্য আমলে নেয়া হয়নি। যা মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ভোক্তাদের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে।
২.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ [সংশোধন ২০১৪, ১৮, ২১]	৭.২.২. ভোক্তা যেন ন্যায্য ও যৌক্তিক মূল্যে মানসম্মত জ্বালানি সেবা পায়, সেজন্য উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, বণ্টন ও বিপণনসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে হবে। ৭.৬.৭. সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠার দ্বারা জ্বালানি খাতকে লেভেল প্লেইং ফিল্ড- এ পরিণত করতে হবে। ৭.৭.২. সরকারি ও ব্যক্তি উভয় খাতে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান ও উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি আমদানি রেগুলেটরি সিস্টেমের আওতাভুক্ত হতে হবে। ৭.৭.৫. মন্ত্রণালয়কে শুধুমাত্র বিধি প্রণয়ন এবং আইন, বিধি ও রেগুলেটরি আদেশসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নজরদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। #জ্বালানি রূপান্তর নীতির সকল ধারা-উপধারা, বিশেষত– ● মালিকানা/স্বত্বাধিকার ● ন্যায্যতা, সমতা ও স্বচ্ছতা ● জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল ● মূল্যহার নির্ধারণ কৌশল ● জ্বালানি রূপান্তর কৌশল ● রেগুলেটরি উন্নয়ন কৌশল ● বিনিয়োগ কৌশল ● প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন কৌশল ● জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল ● মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশল ● পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ কৌশল এবং ● আইনী কৌশল	১. আলোচিত এই বিশেষ বিধান আইনটি আইনবিদ ও ভোক্তাদের কাছে ‘দায়মুক্তি আইন’ নামে পরিচিতি পেয়েছে। আইনটির ৯ ধারায় ‘আদালত, ইত্যাদির এখতিয়ার রহিতকরণ’ উপশিরোনামে বলা হয়েছে, ‘এই আইনের অধীন কৃত বা কৃত বলিয়া বিবেচিত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।’ আইনটির ১০ ধারায় ‘সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ’ উপশিরোনামে বলা হয়েছে, ‘এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি, সাধারণ বা বিশেষ আদেশের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত বলিয়া বিবেচিত কোনো কার্যের জন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো প্রকার আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।’ ১৪ ধারায় ‘এই আইনের অধীন গৃহীত কাজের হেফাজত’ উপশিরোনামে বলা হয়েছে, ‘এই আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, এই আইনের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে ও পরিচালিত হইবে যেন এই আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়নি।’ আইনের এমনসব ধারার কারণে ‘স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত’করণ ব্যর্থ হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে ‘সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা’। এই আইনের মাধ্যমে জ্বালানি খাতের ওপর মন্ত্রণালয়ের সর্বাত্মক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২. এই আইনের তৃতীয় ধারায় গণক্রয় আইনের (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট) কার্যকারিতা উপেক্ষা করে এই আইনের বিধানাবলীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যা কিনা বিদ্যুতের জন্য জ্বালানি আমদানি অথবা বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন অথবা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অন্য কোনো কার্যক্রম, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, আদেশ বা নির্দেশের ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করেছে। এই আইনের অধীনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ক্ষেত্রে জোরপূর্বক ভুল নীতি কৌশল অনুসরণ, দেশের স্বার্থের চেয়ে বিদেশি কোম্পানির স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া এবং নানা রকম অর্থনৈতিক দুর্নীতির অভিযোগ বিভিন্ন সময় উঠেছে। এ

			আইনের আওতায় বিনা দরপত্রে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ ক্রয়, দফায় দফায় অতিরিক্ত মূল্যে চুক্তি নবায়ন, অতি উচ্চমূল্যের এলএনজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) আমদানি, বিনা দরপত্রে গ্যাস-বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ, অবকাঠামো নির্মাণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। যা কিনা ভোক্তা অধিকার বিনষ্ট করেছে এবং ভোক্তার জ্বালানি অধিকারকে বিপন্ন করেছে। ৩. জ্বালানি খাতে বিদ্যমান অপরাপর আইনের এবং ভোক্তাস্বার্থে প্রণীত জ্বালানি রূপান্তর নীতি'র সমস্ত ধরনের বাধ্যবাধকতা এই আইনের মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। যে কারণে জ্বালানি রূপান্তর নীতি ও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অবশিষ্ট সকল আইনই একপ্রকার অকার্যকর হয়ে পড়েছে। জ্বালানি রূপান্তরে জনগণের মালিকানা নিশ্চিত ও সবুজ, সাশ্রয়ী, স্বনির্ভর জ্বালানি খাত উন্নয়নের সমস্ত কার্যক্রম ও কৌশল ব্যাহত হচ্ছে।
৩.	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২	৭.২.২. ভোক্তা যেন ন্যায্য ও যৌক্তিক মূল্যে মানসম্মত জ্বালানি সেবা পায়, সেজন্য উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, বণ্টন ও বিপণনসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে হবে। ৭.৭.১. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বায়োমাস রেগুলেটরি সিস্টেমের আওতাভুক্ত হতে হবে।	১. আইনটির ২২ ধারায় বলা হয়েছে, 'এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সময় সময়, কর্তৃপক্ষকে, তদবিবেচনায় যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ সকল নির্দেশনা পালন করিবে।' ২৪ ধারায় আরো বলা হয়েছে, 'এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য কর্তৃপক্ষ, বা উহার চেয়ারম্যান, কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা রুজু করা যাইবে না বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।' উপরোক্ত ধারাদ্বয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করে এবং কর্তৃপক্ষকে এমন দায়মুক্তি দেয় যে, তা নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, বণ্টন ও বিপণনসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পথে অন্তরায়। ২. আইনের ৬(১৭) ধারায় বলা হয়েছে, 'নবায়নযোগ্য জ্বালানির ট্যারিফ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৪ এর

			অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ।' কিন্তু বাস্তবে আইন লঙ্ঘন করে বিইআরসিকে এড়িয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে মূল্য নির্ধারণে কর্তৃত্ব করছে মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে ভোক্তাপক্ষ থেকে প্রতিকার চেয়ে করা কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের একটি মামলা আদালতে নিষ্পত্তির অপেক্ষায়।
		৭.৯.২. নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়নে পেট্রোবাংলা/বিপিডিবির অনুরূপ স্রেডাকে স্ব-শাসিত সংস্থায় পরিণত হতে হবে। ৭.৪.৪. মন্ত্রণালয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।	৩. স্রেডাকে স্বশাসিত সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিভাগ প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে যুগের চাহিদা এবং এই খাতকে ভবিষ্যতের পথনির্দেশকারী হিসেবে গড়ে তোলার উপায়। কিন্তু আইনে স্রেডাকে এইরূপ কোনো কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি। মন্ত্রণালয়ে এ ধরনের কোনো বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিষয়েও কোথাও কোনো নির্দেশনা নেই। প্রস্তাবিত বিষয়গুলো আইনে অন্তর্ভুক্তি জরুরি।
৪.	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি আইন, ২০১৩	৭.৭.৫. মন্ত্রণালয়কে শুধুমাত্র বিধি প্রণয়ন এবং আইন, বিধি ও রেগুলেটরি আদেশসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নজরদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।	১. আইনের ২১(১) ধারায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যুতৈর মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিইআরসিতে প্রস্তাব পেশের পাশাপাশি বলা হয়েছে, 'অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব পেশ' করা যাবে। এখানে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিকল্প কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষমতা অর্পণের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি বিইআরসি আইনের লঙ্ঘন এবং এটি মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়, যেখানে কিনা তাদের দায়িত্ব হওয়া উচিত রেগুলেটরি আদেশসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নজরদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা।
৫.	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫	৭.২.২. ভোক্তা যেন ন্যায্য ও যৌক্তিক মূল্যে মানসম্মত জ্বালানি সেবা পায়, সেজন্য উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, বণ্টন ও বিপণনসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে হবে। ৭.৭.৫. মন্ত্রণালয়কে শুধুমাত্র বিধি প্রণয়ন এবং আইন, বিধি ও রেগুলেটরি আদেশসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নজরদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।	১. আইনের ৭(২) ও ৭(৩) ধারায় গবেষণা কাউন্সিলের সদস্যদের এবং মনোনীত সদস্যদের 'যে কোনো সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে' অব্যাহতি প্রদান ও সদস্য পদ বাতিল করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সরকার নিজের হাতে রেখেছে। এটা গবেষণা কাউন্সিলকে জ্বালানি খাতে সরকারের ভূমিকা পর্যালোচনার পথে বাধাস্বরূপ। ২. আইনের ৫(১০) ও ৫(১১) ধারায় গবেষণা কাউন্সিলকে গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রয়োগ ও গবেষণার ফল দ্বারা সরকারকে 'পরামর্শ প্রদান' করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ ফলাফল ও করণীয় কার্যকরে কারো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। গবেষণায় প্রাপ্ত করণীয় কার্যকরে সরকার বিইআরসিকে দায়িত্ব দিতে পারতো। কিন্তু মন্ত্রণালয় এখানে সব কিছু নিজের হাতে রেখেছে।

		৭.১১. মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশল ৭.১৩. পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ কৌশল	৩. আলোচিত আইনে গবেষণা কাউন্সিলের অন্যতম দায়িত্ব হতে পারতো বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের তদারকি করা এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া। কিন্তু মানবসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণার কোনো বিষয় আইনে নেই। ৪. ভোক্তা অধিকার পর্যবেক্ষণ ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণার বাধ্যবাধকতা আইনে উল্লেখ নেই। সংশোধনীর দ্বারা এ বিষয়গুলো জরুরি ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
৬.	পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫	৭.১৪.১. প্রণীত আইন ভোক্তার জ্বালানি অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।	প্রণীত আইন ভোক্তার জ্বালানি অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
৭.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬	৭.৬.৪. জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহ শতভাগ জনগণের মালিকানায় নিশ্চিত হতে হবে। ৭.৬.৬. সরকারি মালিকানাধীন এনার্জি ইউটিলিটির শেয়ার ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর নিষিদ্ধ হতে হবে। শতভাগ মালিকানা জনগণের নিশ্চিত হতে হবে। ৭.৬.৮. জ্বালানি সেবা স্বার্থসংঘাত মুক্ত হতে হবে।	১. আইনের ১৭ ধারায় বলা হয়েছে, 'সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, বিভিন্ন কোম্পানীতে থাকা কর্পোরেশনের শেয়ার বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবে।' এটি জ্বালানি সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা নিশ্চিতের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির খেলাপ। ২. আইনের ১৪(১) ধারায় কর্পোরেশনকে আমদানিকৃত তেল ও অন্যান্য পণ্য বিক্রি করে লাভ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যদিও কর্পোরেশন চালিত হয় জনগণের অর্থে এবং এ কারণে অবাণিজ্যিক ক্ষেত্রে লাভ নয়, তার বিক্রয় কাঠামো হওয়ার কথা ব্যয়ভিত্তিক। কিন্তু এই ধারার মাধ্যমে কর্পোরেশনকে ব্যবসা ও মুনাফামুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। অপরদিকে ধারা ২১-এ কর্পোরেশনকে 'জনসেবক' আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু অবাণিজ্যিক ক্ষেত্রে মুনাফার নীতি কর্পোরেশনের জনসেবার নীতিকে বাধাগ্রস্ত করে।
৮.	পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬	৭.১৪.১. প্রণীত আইন ভোক্তার জ্বালানি অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।	প্রণীত আইন ভোক্তার জ্বালানি অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

৯.	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮	৭.২. ন্যায্যতা, সমতা ও স্বচ্ছতা ৭.৯.৩. বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থা বিভাজন করে সরকারি মালিকানাধীনে পিডিবি'র আওতায় গ্যাসখাতের অনুরূপ ইউটিলিটি কোম্পানি গঠন/পুনর্গঠন সম্পন্ন হতে হবে।	১. বিদ্যুৎ আইনে ধারা ১৭ তে মিটার সংক্রান্ত নানা আদেশে লাইসেন্সির স্বার্থরক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু ভোক্তার চাহিদাকে আমলে নেয়া হয়নি। গ্রাহকের দাবিসাপেক্ষে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে মিটার পরীক্ষা করে রিডিং প্রক্রিয়ার সঠিকতা যাচাই করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ২. এ আইনের ৫ ধারায় বিদ্যুৎ খাত পরিচালনায় একটি ইন্ডিপেনডেন্ট সিস্টেম অপারেটর প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও বিদ্যুৎ খাত পরিচালনা ও উন্নয়নে পিডিবির কর্তৃত্ব ও তার আওতায় ইউটিলিটি গঠনের যৌক্তিকতার স্বীকৃতি দেয়া হয়নি।
১০.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০	৭.২.২. ভোক্তা যেন ন্যায্য ও যৌক্তিক মূল্যে মানসম্মত জ্বালানি সেবা পায়, তা নিশ্চিত হতে হবে। ৭.২.৫. জ্বালানি বঞ্চিত প্রান্তিক জনগণের জীবনমান উন্নয়নে জ্বালানির ওপর তাদের স্বত্বাধিকার নিশ্চিত হতে হবে।	১. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইনের ২০২০ সালের সংশোধনীতে কমিশনকে বছরে 'একাধিকবার' মূল্যহার পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে আইনটিকে একটি অন্যায্য ও অযৌক্তিক আইনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ২. বছরে একাধিকবার মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে আইনটির ইতিপূর্বেকার ভোক্তাবান্ধব চরিত্র হরণ করে ভোক্তার জ্বালানি অধিকারকে হুমকিতে ফেলা হয়েছে। ৩. বছরে একাধিকবার মূল্যবৃদ্ধির আইন জ্বালানি বঞ্চিত প্রান্তিক জনগণের জীবনমান উন্নয়নে প্রতিবন্ধক হয়েছে এবং জ্বালানির ওপর তাদের স্বত্বাধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ৪. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইনের ২০২২ সালের সংশোধনীটি ভোক্তা অধিকারের দিক থেকে ভয়ঙ্কর ও বিধ্বংসী। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এই সংশোধনী করা হয়েছে। ০১ ডিসেম্বর ২০২২ রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২২' জারি করেন। এতে বলা হয়, এ আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছু থাকুক না কেন, বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দিয়ে ভর্তুকি সমন্বয়ের জন্য জনস্বার্থে কৃষি, শিল্প, সার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গৃহস্থালি কাজের চাহিদা অনুযায়ী এনার্জির

			(জ্বালানি) নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, মজুতকরণ, বিপণন, সরবরাহ, বিতরণ এবং ভোক্তাপর্যায়ে ট্যারিফ নির্ধারণ, পুনর্নির্ধারণ বা সমন্বয় করতে পারবে। দাম নির্ধারণে বিইআরসির সময় নেওয়ার ক্ষেত্রেও সংশোধনী আনা হয়েছে। আগে গণশুনানি করে ৯০ দিনের মধ্যে দাম নির্ধারণ করার বাধ্যবাধকতা ছিল। এটি কমিয়ে ৬০ দিন করা হয়েছে। ৫. সরকার একপ্রকার তাড়াহুড়া করেই বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন সংশোধন করে নিজেদের কাছে দাম বাড়ানোর ক্ষমতা নিয়েছে। এ ছাড়া ইচ্ছা খুশিমতো দাম বাড়াতেই এটি করা হয়েছে। গত আগস্টে একলাফে জ্বালানি তেলের দাম ৪২ থেকে ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ জ্বালানির দাম বাড়ানোর প্রবিধানমালা অনুমোদন না দিয়ে সরকার নিজের হাতে এই মূল্যবৃদ্ধির ক্ষমতা রেখে দিয়েছিল। যেমন দেখা যায়, ২০২২ সালের জুনে ১১৭ শতাংশ দাম বাড়ানোর প্রস্তাব নিয়ে বিইআরসিতে আসার পর গ্যাসের দাম বেড়েছে ২৩ শতাংশ। ৬৬ শতাংশ দাম বাড়াতে এসে পাইকারি বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ২০ শতাংশ। আবার বিইআরসিতে দাম বাড়াতে এলে জ্বালানি খাতের অনিয়ম-অদক্ষতার বিষয়গুলোও সামনে চলে আসে। কিন্তু প্রজ্ঞাপন দিয়ে তাৎক্ষণিক দাম বাড়ানো হলে জবাবদিহির বিষয় থাকে না। সংশোধনীতে ‘বিশেষ পরিস্থিতির’ কথা বলা হলেও কখন বিশেষ পরিস্থিতি হবে না হবে এটি পুরোপুরি সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। এই সংশোধনী বাতিল না হলে এই আইন বা বিইআরসির আর কোনো কার্যকারিতা থাকবে না।
		৭.৭.১. কয়লা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বায়োমাস রেগুলেটরি সিস্টেমের আওতাভুক্ত হতে হবে।	৪. জ্বালানি রূপান্তর নীতিতে প্রস্তাবিত এসব বিষয় অবিলম্বে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এসব সংযুক্তি

		৭.৭.২. সরকারি ও ব্যক্তি উভয় খাতে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান ও উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি আমদানি রেগুলেটরি সিস্টেমের আওতাভুক্ত হতে হবে। ৭.৭.৩. রেগুলেটরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি এবং আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নে অংশীজনদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হতে হবে। ৭.৭.৪. সরকারি খাতের পাশাপাশি ব্যক্তিখাতকেও রেগুলেটরি সিস্টেমের আওতাভুক্ত হতে হবে। ৭.৭.৫. মন্ত্রণালয়কে শুধুমাত্র বিধি প্রণয়ন এবং আইন, বিধি ও রেগুলেটরি আদেশসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নজরদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। ৭.৭.৬. কারিগরি পেশাদার নিজস্ব জনবল দ্বারা স্বাধীনভাবে সংস্থাসমূহের পরিচালনা নিশ্চিত হতে হবে। ৭.৭.৭. রেগুলেটরি সংস্থার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত হতে হবে।	আইনটিকে ভোক্তাবান্ধব ও জ্বালানি নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে কার্যকরী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

গবেষণার আওতাভুক্ত নীতি ও বিধিমালাসমূহ ও তার ম্যাপিং

ক্রম	নীতি ও বিধিমালা	ম্যাপিং
১.	কয়লা নীতি (খসড়া), ২০১০	সংশোধনী ও জরুরিভিত্তিতে প্রণয়ন প্রয়োজন।
২.	প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ (ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	সংশোধনী প্রয়োজন।
৩.	প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন (ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	সংশোধনী প্রয়োজন।

৪.	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২	সংশোধনী প্রয়োজন।
৫.	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২, নবায়নকৃত ২০২২	সংশোধনী প্রয়োজন।
৬.	বিটুমিন নীতি, ২০১২	পর্যালোচনা প্রয়োজন।
৭.	ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং অয়েল রিফাইন ও মানসম্মত বেইস অয়েল উৎপাদনের অনুমোদন প্রদানের নীতিমালা, ২০০৯	সংশোধনী প্রয়োজন।
৮.	বেসরকারী পর্যায়ে স্থাপিত ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের জন্য কনডেনসেট নীতিমালা, ২০১৪	পর্যালোচনা প্রয়োজন।
৯.	গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৫	সংশোধনী প্রয়োজন।
১০.	গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী (গৃহস্থালী গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য), ২০১৪	সংশোধনী প্রয়োজন।
১১.	গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী (বাণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ, পাওয়ার, সিএনজি ও চা-বাগান গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য), ২০১৪	সংশোধন ও পুনঃপর্যালোচনা প্রয়োজন।
১২.	জ্বালানী তেল বিক্রয়ের লক্ষ্যে নতুন ফিলিং স্টেশন/সার্ভিস স্টেশন স্থাপনে ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১৪	পর্যালোচনা প্রয়োজন।
১৩.	সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪	পর্যালোচনা প্রয়োজন।
১৪.	বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬	সংশোধন ও পর্যালোচনা প্রয়োজন।
১৫.	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৬	পূর্ণাঙ্গ আইন প্রয়োজন।
১৬.	(বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬	সংশোধন ও পর্যালোচনা প্রয়োজন।
১৭.	এলপিজি বিধিমালা, ২০১৬, নবায়নকৃত ২০২১	সংশোধনী প্রয়োজন।
১৮.	নেট মিটারিং গাইডলাইন, ২০১৮	পর্যালোচনা প্রয়োজন।
১৯.	জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা, ২০১৮	পর্যালোচনা প্রয়োজন।

২০.	পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮	পর্যালোচনা প্রয়োজন।
২১.	নতুন ফিলিং স্টেশন/সার্ভিস স্টেশন স্থাপনে ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১৫, ২০১৮	পর্যালোচনা প্রয়োজন।
২২.	পুনঃযাচাইকৃত বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা ২০১৬ চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ২০১৮	সংশোধন ও পুনঃপর্যালোচনা প্রয়োজন।
২৩.	বেসরকারি খাতে এলএনজি স্থাপনা নির্মাণ, আমদানি ও সরবরাহ নীতিমালা, ২০১৯	সংশোধন প্রয়োজন।
২৪.	দেশজ প্রাকৃতিক তেল/গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা, ২০১৯	পর্যালোচনা প্রয়োজন।
২৫.	প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ নীতিমালা, ২০১৯	সংশোধন ও পর্যালোচনা প্রয়োজন।
২৬.	বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০	সংশোধন ও পর্যালোচনা প্রয়োজন।
২৭.	এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০২১	সংশোধন ও পর্যালোচনা প্রয়োজন।

জ্বালানি রূপান্তর নীতির আলোকে নীতি ও বিধিমালাসমূহ পর্যালোচনা ২০০৯-২০২১

নিম্নে এ নীতি ও বিধিমালাসমূহের বিদ্যমান ভোক্তাস্বার্থবিরোধী উপাদান এবং ভোক্তাবান্ধব উপাদানের অনুপস্থিতির বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে ভোক্তাস্বার্থ সুরক্ষায় প্রণীত জ্বালানি রূপান্তর নীতি ২০২২-কে নির্দেশক ভূমিকায় রাখা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের নীতি ও বিধিমালা পর্যালোচনা ২০০৯-২০২১

ক্রম	নীতি ও বিধিমালা	পর্যালোচনা
১.	কয়লা নীতি (খসড়া), ২০১০	২০১০ সালে খসড়া প্রণয়ন হলেও আজো চূড়ান্ত কয়লানীতি হয়নি। অথচ কয়লা খাতে নানা ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রমসহ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র চলছে। নীতিগত দিকনির্দেশনা না থাকায় যখন যেমন ইচ্ছা পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে, আবার তা বাতিল হচ্ছে। এভাবে কয়লা খাত উন্নয়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং পরিকল্পনাহীনতা ও অব্যবস্থাপনার মধ্য

		দিয়ে এগোচ্ছে। কয়লা খাত উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগ নীতি ও কৌশল অস্পষ্ট। খনি উন্নয়ন পদ্ধতি ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ মুখাপেক্ষী। তাই ভূগর্ভের নবায়নযোগ্য পানিসম্পদ ধ্বংসের প্রশ্নে দুটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সম্ভব উন্মুক্ত খনির ব্যাপারে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তা বিচার-বিশ্লেষণ করে নীতি তৈরি করা হয়নি। কয়লা আমদানির ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট কোনো গাইডলাইন নেই। যে পরিকল্পনামাফিক আমদানি করা কয়লায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাতে দীর্ঘমেয়াদি কয়লা সরবরাহ এবং সে কয়লায় উৎপাদিত বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয়হার দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য কতটা উপযোগী, তার কোনো বিচার-বিশ্লেষণ নেই।
২.	প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ (ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	বিভিন্ন স্তরের ভোক্তা, বিশেষত শিল্প পর্যায়ে প্রান্তিক ছোট, বড়, মাঝারি গ্রাহকের মধ্যে গ্যাস বন্টন ও মূল্যহার নির্ধারণের কোনো নীতিমালা নেই।
৩.	প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন (ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণে অপরিকল্পিত উন্নয়ন গ্যাসের সরবরাহ ব্যয়হার বাড়াচ্ছে। এসব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও ঠিকাদার নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। সঞ্চালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণে এবং মূল্যহার নির্ধারণে এসব কোম্পানি কার্যক্রম কমিশনের নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি।
৪.	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২	মাইনিং রুলস সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এর আওতায় রয়ালটির বিনিময়ে জ্বালানি সম্পদ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীর হাতে তুলে দেয়া যায়। ভোক্তাপক্ষের দীর্ঘদিনের দাবি থাকলেও খনিজসামগ্রী রপ্তানি নিষিদ্ধ আইন নেই। এটা থাকলে খনিজসামগ্রীর ওপর জনগণের মালিকানা ও টেকসই টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতের পথ প্রশস্ত হতো।
৫.	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২, নবায়নকৃত ২০২২	২০০৯ সালের ৩০ জুলাই প্রদত্ত এক আদেশে ১১.২২ শতাংশ গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি জনিত অর্থে কমিশন গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করে কিন্তু নীতিমালা না থাকার অজুহাতে ২০১২ সাল পর্যন্ত এ অর্থ ব্যবহার করতে দেয়নি মন্ত্রণালয়। এই অর্থ পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা গেলে ভোক্তা ও জ্বালানি খাত লাভবান হতে পারতো। অন্যদিকে নীতিমালা ছাড়াই চলছে বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক জ্বালানি তেল আমদানি। এক্ষেত্রে কোম্পানি মালিকদের লাভবান ও ভোক্তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কথা থাকলেও এলএনজি আমদানির জন্য সেখান থেকে ঋণের নামে অর্থ ছাড় করা হয়েছে। যা আর পাওয়া যাবে কিনা

		সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সন্দিহান। কারণ এটাকে অলাভজনক বিধায় অনুদান হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হতে পারে। এটা ঘটেছে বিইআরসির অগোচরে। অথচ নীতিমালা অনুযায়ী এ তহবিলের অর্থ নিয়ে কিছু করতে গেলে বিইআরসির অনুমোদন প্রয়োজন। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ উৎসে কর্তনের সুযোগ রাখা হয়নি। যে কারণে এ টাকা পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয়ের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে গ্রাহকের এ খাতে দেয়া তিন হাজার কোটি টাকা নিজেদের লাভ হিসেবে দেখিয়ে সরকারি কোষাগারে জমা করে দেয় পেট্রোবাংলা। বিইআরসি এ কাজকে আইনের লঙ্ঘন বলে চিঠি দিলে পেট্রোবাংলা ব্যাখ্যা দিয়ে তা বিধিসম্মত করার চেষ্টা চালায়। বিদেশি কোম্পানি গাজপ্রমকে দিয়ে কূপ খননের ক্ষেত্রেও এ তহবিল থেকে টাকা দেয়া হয়। যদিও তা কেবলমাত্র দেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পে ব্যবহার করার কথা ছিল। নীতিমালার সর্বশেষ সংশোধনীতে এ তহবিলের ওপরে মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা আরো বাড়ানো হয়েছে। ভোক্তাদের অর্থে গঠিত গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থে দেশীয় কোম্পানির সক্ষমতা বাড়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এ তহবিল গঠনের সময় সরবরাহকৃত গ্যাসে বিদেশি কোম্পানির গ্যাসের অনুপাত ছিল ৪৮ শতাংশ। এখন হয়েছে ৬০ শতাংশ। দেশীয় কোম্পানিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার কথা ভাবা হয়নি। ওই অর্থ ভোক্তাদের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়নি।
৬.	বিটুমিন নীতি, ২০১২	বিটুমিন উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও মূল্যহার নির্ধারণে ভোক্তাস্বার্থ বিবেচনায় আনা দরকার।
৭.	ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং অয়েল রিফাইন ও মানসম্মত বেইস অয়েল উৎপাদনের অনুমোদন প্রদানের নীতিমালা, ২০০৯	ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং অয়েল রিফাইন ও মানসম্মত বেইস অয়েল উৎপাদনে ব্যক্তিখাত ও সরকারের খাতের মধ্যে সমতা নিশ্চিতকরণে নীতিমালার সংশোধনী আনা প্রয়োজন। পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়েও পর্যবেক্ষণ কাঠামোর সার্বক্ষণিক নজরদারির ব্যবস্থা থাকা দরকার।
৮.	বেসরকারী পর্যায়ে স্থাপিত ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের জন্য কনডেনসেট নীতিমালা, ২০১৪	নীতিমালায় একটি হিসাব নির্ধারণ করে দিতে হবে যে, কী পরিমাণ কনডেনসেট থেকে কী পরিমাণ পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন হবে। অন্যথায় হরিলুট বন্ধ করা যাবে না। কনডেনসেট খাতে কালোবাজারি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে বিইআরসিকে উদ্যোগী হতে হবে।
৯.	গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৫	গণশুনানিতে ধারণা পাওয়া যায়, সিবিএ, ঠিকাদার ও মন্ত্রণালয় মিলেমিশে গ্যাস কোম্পানি চালায়। কোম্পানি প্রশাসন অসহায়। জনবল নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। সঞ্চালন ও বিতরণে অপরিকল্পিত উন্নয়ন গ্যাসের সরবরাহ ব্যয়হার বাড়াচ্ছে। এসব উন্নয়ন

		প্রকল্প গ্রহণ ও ঠিকাদার নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। এসব কোম্পানি কার্যক্রম কমিশনের নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি। জনবল নিয়োগ প্রস্তাব ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে কমিশনের আগাম অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা অবশ্যক। তাছাড়া স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য জনবল নিয়োগ ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন ক্ষমতা কোম্পানির কাছ থেকে প্রত্যাহার করে পৃথক কোনো সংস্থা বা কমিটির ওপর অর্পণ করা জরুরি। এসব নির্দেশনা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ গ্যাস বিপণন নীতিমালা দরকার।
১০.	গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী (গৃহস্থালী গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য), ২০১৪	সিস্টেম লস সুবিধা দিয়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে গ্যাস চুরি ও পরিমাপে কারচুপিকে সুরক্ষা দেয়া হয়। চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে অস্বাভাবিক মূল্যে লাইসেন্সিরা সম্পদ অর্জন করে এবং সে সম্পদ স্বল্প ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত থাকলেও তা মূল্যহারে সমন্বয় হয়। ফলে মূল্যহার লুণ্ঠনমূলক বলে বিবেচিত এবং ভোক্তারা অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিষয়টি প্রবিধানের অজুহাতে বজায় রাখা হচ্ছে, যা অন্যায় ও অগ্রহণযোগ্য। সিস্টেম লস সুবিধা দিয়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে গ্যাস চুরি ও পরিমাপে কারচুপিকে সুরক্ষা দেয়া হয়। চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে অস্বাভাবিক মূল্যে লাইসেন্সিরা সম্পদ অর্জন করে এবং সে সম্পদ স্বল্প ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত থাকলেও তা মূল্যহারে সমন্বয় হয়। ফলে মূল্যহার লুণ্ঠনমূলক বলে বিবেচিত এবং ভোক্তারা অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিষয়টি প্রবিধানের অজুহাতে বজায় রাখা হচ্ছে, যা অন্যায় ও অগ্রহণযোগ্য। ২০১৫ সালে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির আদেশের ১০(১) উপানুচ্ছেদে বলা হয়েছে, গ্যাসের অপচয় ও অপরিকল্পিত ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক শ্রেণীতে গ্রাহকদের জন্য প্রিপেইড মিটার চালুকরণ এবং সব বিধিবহির্ভূত বিতরণ নেটওয়ার্ক ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যব্যবস্থা বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কার্যব্যবস্থা ওই বছরের মধ্যে বিইআরসিতে দাখিল করতে হবে। অদ্যাবধি সময়াবদ্ধ কার্যব্যবস্থা দাখিল করা হয়নি। বিইআরসির কোনো আদেশই প্রতিপালিত হয়নি।
১১.	গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী (বাণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ, পাওয়ার, সিএনজি ও চা-বাগান গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য), ২০১৪	বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের মৌলিক নীতি হলো এ বিদ্যুৎ ব্যক্তি খাতে উৎপাদন হবে। বিদ্যুৎ প্লান্ট নির্মাণ হবে আনসলিসিটেডভাবে উৎপাদনকারী নিজ উদ্যোগে জ্বালানির সংস্থান করবে। নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যুতের ক্রেতা খুঁজে নেবে। এভাবেই এ বিদ্যুতের বাজার সৃষ্টি হবে। এ বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি সরবরাহ করা কিংবা উৎপাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় করা সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। অথচ পিডিবি ও আরইবির মতো সরকারি সংস্থা যেন এমন সব বিদ্যুৎ

		কিনতে বাধ্য হয়, সে জন্য নানা কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। কোনো কারণে সরকারের পক্ষ থেকে এ বিদ্যুৎ ক্রয় করার যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সে ক্রয় মূল্যহার নির্ধারণের এখতিয়ার বিইআরসির। ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে। সেই নীতিমালায় নির্ধারিত মূল্যহারেই সরকারকে এ বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেনার কথা। কিন্তু নিয়ম করেই তার ব্যত্যয় ঘটে চলেছে। ক্যাপটিভ বিদ্যুতে গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা নিশ্চিতকরণে কোনো নীতিমালা নেই। উন্মুক্ত সভার মতামতের ভিত্তিতেই বাণিজ্যিক প্লান্টে সরবরাহকৃত গ্যাসের মূল্যহার ক্যাপটিভ প্লান্টে সরবরাহকৃত গ্যাসের সমমূল্যহারে নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু প্লান্টমালিক তার এ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্যহার আইপিপিকে দেয়া গ্যাসের মূল্যহারের সমান নির্ধারণের দাবি করেন। ওই মূল্যহার নির্ধারণের আদেশ চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। এ মামলা মোকাবেলা না করে বাদীর সঙ্গে বিইআরসি আপস করে এবং বাণিজ্যিক প্লান্টে দেয়া গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের আদেশ পরিবর্তন করে সে মূল্যহার আইপিপিকে দেয়া গ্যাসের মূল্যহারের সমান নির্ধারণ করে পুনরায় আদেশ দেয়। এ ব্যাপারে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের কোনো মতামত নেয়া হয়নি। এ কার্যক্রমের দ্বারা অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সঙ্গতিহীন ও অন্যায্য কার্যক্রমের একটি উদাহরণ বিইআরসি সৃষ্টি করেছে। মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে বিইআরসিকে প্রভাবিত করেছে, তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে। নীতির এমন খেলাপ বিইআরসি করতে পারে না। ২০১৫ সালে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির আদেশের ১০(১) উপানুচ্ছেদে বলা হয়েছে, গ্যাসের অপচয় ও অপরিকল্পিত ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে সিএনজি, শিল্প, চা-বাগান, বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও সার শ্রেণীতে গ্রাহকদের জন্য ইভিসি মিটার চালু করতে হবে। অদ্যাবধি বিইআরসির এ আদেশ প্রতিপালিত হয়নি।
১২.	জ্বালানী তেল বিক্রয়ের লক্ষ্যে নতুন ফিলিং স্টেশন/সার্ভিস স্টেশন স্থাপনে ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১৪	ফিলিং স্টেশনসমূহ নিয়মিতভাবে তদারকি করতে হবে এবং নীতিমালার শর্তপূরণে অক্ষম স্টেশন ও ডিলারকে উৎখাতে বিইআরসির ক্ষমতা ও উৎখাতের পদ্ধতি বিধিমালায় সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
১৩.	সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪	সাদামাটি উত্তোলনে পরিবেশের ক্ষতির ক্ষেত্রে লাইসেন্স বাতিল, শাস্তি ও তা কার্যকরণের পদ্ধতি নির্দিষ্ট হতে হবে।
১৪.	বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬	বিভিন্ন স্তরের ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ বন্টন ও মূল্যহার নির্ধারণ নীতিমালা নেই।

১৫.	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৬	এ কারণে জ্বালানির যৌক্তিক ব্যবহার ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিতে এ বিধিমালা যথেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ নয়। জ্বালানি দক্ষতা সংরক্ষণে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন জরুরি।
১৬.	(বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬	বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সামঞ্জস্যহীন। তাছাড়া সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা স্বল্প ব্যবহৃত। তাতে অস্বচ্ছতা বাড়ায় দুর্নীতি বেড়েছে। ফলে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় হারও বেড়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যৌক্তিকভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন হয় না। কিন্তু এ ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম নিরুৎসাহিত করা হয়নি। ভোক্তাকে এর দায় বহন করতে হয়েছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণে বিদ্যমান প্রবিধানমালা ভোক্তাকে ন্যায্যমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যর্থ হচ্ছে।
১৭.	এলপিজি বিধিমালা, ২০১৬, নবায়নকৃত, ২০২১	এলপিজি খাতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের সমতা আনয়ন জরুরি। এখাতে ব্যভসায়ীদের মনোপলি বা একাধিপত্য ভোক্তাদের চরম ক্ষতি ও সংকটের মুখে ফেলেছে। ব্যবসায়ীরা এলপিজির সর্বোচ্চ মূল্য চান। কিন্তু বিইআরসির প্রবিধানমালা অনুযায়ী, ন্যূনতম মূল্যে মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে তার আদেশ দ্বারা। কিন্তু ব্যবসায়ীরা বিইআরসি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে এলপিজি বিক্রি করছে, অন্যদিকে সেই অধিক মূল্যের চেয়েও বেশি হারে মূল্য বৃদ্ধির জন্য বিইআরসিকে চাপ দিচ্ছে। বিইআরসি ব্যবসায়ীদের দাবি অনুযায়ী মূল্যহার নির্ধারণ করছে। এমন ঘটনা নিয়ম করেই ঘটে চলেছে।
১৮.	নেট মিটারিং গাইডলাইন, ২০১৮, সংশোধিত ২০১৯	অনগ্রিড গ্রাহককে বিশেষ প্রণোদনা দিতে হবে।
১৯.	জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা, ২০১৮	জ্বালানি সংরক্ষণে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন এবং তার অধীনে নিজস্ব নিরীক্ষা দল গঠন করা প্রয়োজন। অদক্ষ বিদ্যুকেন্দ্র চিহ্নিতকরণ এবং তার জ্বালানি সরবরাহে সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন।
২০.	পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮	পেট্রোলিয়াম আইন সংশোধনকল্পে এর প্রবিধানমালা পুনঃপর্যালোচনা প্রয়োজন।
২১.	নতুন ফিলিং স্টেশন/সার্ভিস স্টেশন স্থাপনে ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১৫, ২০১৮	ফিলিং স্টেশন অনুমোদনের ক্ষেত্রে এলাকার আয়তন অনুযায়ী স্টেশন সংখ্যা বরাদ্দকরণের ক্ষমতা বিইআরসির হাতে থাকতে হবে।
২২.	পুনঃযাচাইকৃত বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা ২০১৬ চূড়ান্ত	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের কেনাকাটায় বিশেষ বিধান আইনের বরাতে গণক্রয় আইন ও বিধিমালা উপেক্ষা করা হচ্ছে। এটা অস্বচ্ছতা ও

	প্রতিবেদন, ২০১৮	দুর্নীতির পথ খুলে দিয়েছে। বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে বিইআরসির পরামর্শ ছিল ক্যাপটিভ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করা। কিন্তু সরকারি নীতিতে অগ্রাধিকার পায় রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট এবং কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট। প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর পর্যালোচনায় দেখা যায় বেসরকারি খাত জ্বালানিতে অগ্রাধিকার পায়, সরকারি খাত বসে থাকে। প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও পিডিবির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ব্যয় কম। কিন্তু সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত বেসরকারি খাত থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করা। এর ফলে ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জ্বালানির অভাবে কম ব্যয়ের সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ রাখা হয় আর সেই জ্বালানি দেয়া হয় বেসরকারি কোম্পানিকে তাদের কাছ থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনা হয়। সরকারের এ নীতি জনস্বার্থ লঙ্ঘন করছে। রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট ও কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট এর কারণে বিদ্যুৎ খাত ও উন্নয়ন রোড ম্যাপ অনুযায়ী বিদ্যুতের মূল্য হার কমিয়ে আনা যায়নি। ফলে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতুন উন্নয়ন সফল হয়নি। বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা, জ্বালানি বিষয়ক সরকারের নীতি কোনো সুস্পষ্ট নীতিমালা ধরে এগোয়নি। রেন্টাল নির্ভরতা দীর্ঘায়িত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পুরোটাই ব্যক্তিখাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল, বিদ্যুৎ খাতের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে সরকারি খাতের পাশাপাশি ব্যক্তিখাত মালিকানায় বিদ্যুৎ উৎপাদন হলে উভয়ের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হবে এবং একচেটিয়া প্রভাব থেকে মুক্ত হবে বিদ্যুৎ খাত। বাস্তবে সরকারি খাতকে কৌশলে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্যক্তিখাত বিদ্যুৎ খাতকে গ্রাস করছে এবং পরিস্থিতি এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে। আইপিপি ও এসআইপিপির আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ আশানুরূপ না হলেও রেন্টাল ও কুইক রেন্টালের মাধ্যমে সে অংশগ্রহণ ফলপ্রসূ হয়েছে। তাতে একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত ব্যক্তিখাতে নেয়া সম্ভব হচ্ছে, অন্যদিকে বিদ্যুতের দাম দ্রুত বাড়ানো সম্ভব হওয়ায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ আমদানির বাজারে পরিণত হতে যাচ্ছে। মার্চেন্ট প্লান্টের বিদ্যুৎ, আমদানিকৃত কয়লায় উৎপাদিত ব্যক্তিখাতের বিদ্যুৎ, ব্যক্তিখাতের আমদানিকৃত জ্বালানি তেলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ এবং সরকারি খাতে আমদানিকৃত এলএনজিতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ- এমন সব বিদ্যুৎকে গ্রিডে আনা হয়েছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় আমদানি বিদ্যুতের দামের তুলনায় অনেক বেশি

		পড়ছে। এটা জ্বালানি নিরাপত্তাকে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতিমালা-২০০৮ অকার্যকর। ব্যক্তিখাত নিজ উদ্যোগে জ্বালানি সংগ্রহ ও ক্রেতা সংগ্রহ করে না। সরকার ব্যক্তিখাতে ভর্তুকিমূল্যে জ্বালানি সরবরাহ করে এবং তাদের উৎপাদিত বিদ্যুৎ চড়া দামে কেনে। এটা বিদ্যুৎখাতে জনগণের অর্থ লুণ্ঠনের পথ খুলে দিয়েছে। সরকারি ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ক সমন্বিত নীতিমালা প্রয়োজন, যা উভয় খাতের মধ্যে সমান লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করবে। বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী পিকিং পাওয়ার প্লান্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা মোট উৎপাদন ক্ষমতার ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের বেশি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ২০১৪ সাল নাগাদই তা হয়ে যায় ৬০ শতাংশ। নীতিমালার এমন ব্যত্যয়ের প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্ভব হবে না বলে ২০২১ সাল পর্যন্ত রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল প্লান্ট বাস্তবায়নের পক্ষে। তাই বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে এই মহাপরিকল্পনা অকার্যকর ও অর্থহীন।
২৩.	বেসরকারি খাতে এলএনজি স্থাপনা নির্মাণ, আমদানি ও সরবরাহ নীতিমালা, ২০১৯	এলএনজি খাত ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হতে হবে। নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধান ও মজুদ বৃদ্ধি দ্বারা জ্বালানি আমদানী বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে আনা নিশ্চিত হতে হবে।
২৪.	দেশজ প্রাকৃতিক তেল/গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা, ২০১৯	গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন রেগুলেটরি সিস্টেমের আওতাভুক্ত হতে হবে। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত দেশীয় তিনটি কোম্পানি একীভূত হয়ে একটি জাতীয় কোম্পানি গঠিত হতে হবে। স্থলভাগে বিদেশি কোম্পানিকে যুক্ত করার বিধান বাতিল করতে হবে। জ্বালানি বিভাগেকে এ বিধিমালার ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, এটা বাতিল করে এই ক্ষমতা বিইআরসিকে দিতে হবে।
২৫.	প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ নীতিমালা, ২০১৯	গ্যাস বরাদ্দের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের আগে সরকারি বিদ্যুকেন্দ্রকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি এ নীতিমালায় উল্লেখ নেই। অবিলম্বে সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ নীতিমালা সংশোধন করতে হবে।
২৬.	বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০	বিধিমালায় লাইসেন্সির স্বার্থরক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু ভোক্তার চাহিদাকে আমলে নেয়া হয়নি। গ্রাহকের দাবিসাপেক্ষে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে মিটার পরীক্ষা করে রিডিং প্রক্রিয়ার সঠিকতা যাচাই করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
২৭.	এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা,	বিইআরসি আইনের অধীনে ভোক্তাপক্ষের অভিযোগ নিষ্পত্তির বাধ্যবাধকতা বিষয়ক সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা এই বিধিমালায় থাকা

	২০২১	প্রয়োজন। সামিট পাওয়ারের সঙ্গে ২০১১ সালের ১২ মে সম্পাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি অসাধু উপায়ে ৩ আগস্ট ২০১১ তারিখে সংশোধন করে সামিট পাওয়ারকে লাভবান করা হয়। এটা বিইআরসিকে তদন্তের অনুরোধ জানালেও তারা তা করেনি।

এছাড়া বিভিন্ন নীতিমালা ও বিধিমালার মধ্যে আরো যেসব অসঙ্গতি, বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা দেখা যায়, তার মধ্যে রয়েছে-

১. সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন নীতি যুগোপযোগী নয়। প্রথমত, দক্ষ কারিগরি জনবল প্রাপ্তির ব্যবস্থা অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, ওঅ্যান্ডএম কস্টসহ সুদের হার কমানোর ব্যবস্থা নেই। তৃতীয়ত, বিনিয়োগ আহবানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণ করা যায়নি। ব্যক্তি খাত সৌর বিদ্যুৎ ও বিইআরসির আওতাভুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু তা ঘটেনি।

২. ভর্তুকি মূল্যহার নির্ধারণের নীতিমালা নেই। ফলে মূল্যহার বৃদ্ধির অভিঘাত থেকে প্রান্তিক ভোক্তাকে সুরক্ষা দেওয়া যাচ্ছে না।

৩. মোট ব্যয়ের ২০-২৫ শতাংশ বিনিয়োগ করে ব্যক্তিখাত সহজেই ৭৫-৮০ শতাংশ ঋণ পায়। অন্যদিকে সরকারি খাতে অর্থ বরাদ্দ একটি জটিল বিষয়। ঋণপ্রাপ্তিও সহজ নয়। এখানে প্রতিযোগিতা অসম। লাভজনক সরকারি কোম্পানির মালিকানা শেয়ার বিক্রি করে একদিকে ব্যক্তিমালিকানায় দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে অলাভজনক সংস্থা বা কোম্পানি সরকারি মালিকানায় রয়ে যাচ্ছে। এসব প্রক্রিয়ায় সরকারি খাতকে ইচ্ছাকৃতভাবে সংকটে ফেলে ব্যক্তি খাতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। তাতে বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যয় বাড়ছে; কিন্তু বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এটা সরকারের কৌশল ও নীতির সমস্যাকেই সামনে নিয়ে আসে।

৪. গ্রিড কোডের নির্দেশনা মেনে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনগুলোয় সরবরাহ করা হয় না এবং কোড মেনে তা বিতরণ বা বণ্টনও করা হয় না। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ লাইসেন্সিরা কেউই গ্রিড কমপ্লায়েন্স নয়। ফলে গ্রিড সার্বক্ষণিক চরম ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

৫. গ্রিডকোড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলডিসির কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা বা তার বিকল্প কাঠামোর অনুপস্থিতি গ্রিডকেন্দ্রীক বিদ্যুৎ বিপর্যয় সংকটকে বজায় রেখেছে। মন্ত্রণালয়ের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে ডেসা আইন ১৯৯০ (বিলুপ্ত)-এর অজুহাতে ডিপিডিসি ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন ও গ্রিড উপকেন্দ্র তার অধীনে রেখেছে এবং পিডিবির কাছ থেকে কেনা বাল্ক বিদ্যুতের ৮৮.৬৫ শতাংশ ১৮টি পয়েন্টে ১৩২ কেভি ভোল্টেজ লেভেলে ক্রয় করে। যা গ্রিডের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। এমন অবস্থা বিদ্যুৎব্যবস্থা সুরক্ষায় অত্যন্ত বিপজ্জনক।

৬. সার ও সিমেন্টের মতো জ্বালানিজাত পণ্য রপ্তানি হয়। জ্বালানিজাত পণ্য রপ্তানি বন্ধ করার জন্য নীতিমালায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা দরকার।

৭. আইন ও নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পথে বড় বাধা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে ডাউনস্ট্রিম কোম্পানিতে লোক নিয়োগ। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, মুখ্য সচিব বা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সচিব যখন বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতে প্রকল্প বা কোম্পানির চেয়ারম্যান হন, তখন তারা যাই করেন না কেন দায়মুক্তি

পেয়ে যান। তাদের দোষ ত্রুটি ধরার কোনো সুযোগ থাকে না। এ বিষয়ে নীতিমালা প্রয়োজন।

৮. বিইআরসি আইনের অধীনে ভোক্তাপক্ষের অভিযোগ নিষ্পত্তির নিমিত্তে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা বা বিধিমালা থাকা প্রয়োজন। সামিট পাওয়ারের সঙ্গে ২০১১ সালের ১২ মে সম্পাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি অসাধু উপায়ে ৩ আগস্ট ২০১১ তারিখে সংশোধন করে সামিট পাওয়ারকে লাভবান করা হয়। এটা বিইআরসিকে তদন্তের অনুরোধ জানালেও তারা তা করেনি।

৯. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি তেল খাতের সরকারি কোম্পানির পরিচালনা বোর্ড জ্বালানি বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে সংখ্যাধিক্য সিভিল সার্ভেন্ট সদস্য নিয়ে চলছে। সেসব বোর্ডে শিক্ষাবিদ, আইনবিদ ও ব্যবসায়ীর উপস্থিতি নামে মাত্র। বিদ্যুৎ বা জ্বালানি প্রকৌশলীর মতো পেশাদার ব্যক্তিদের উপস্থিতি গৌণ। সরকার তার মালিকানাধীন এসব কোম্পানি পরিচালনা করাতে চায় তার লোক দিয়ে। সরকার তার লোক বলতে বোঝে চাকরিরত সিভিল সার্ভেন্টদের। অথচ এভাবে পরিচালনার ফলে এ খাত দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন করতে পারে না, দুর্নীতিমুক্তও হয় না। অভিজ্ঞ, যোগ্য ও সৎ পেশাদার ব্যক্তিদের হাতে সে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় না। এ কারণে কোম্পানিগুলো ভোক্তাস্বার্থ নিশ্চিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

১০. বিদ্যুৎ খাত ও তার সব কোম্পানি সংবিধানমতে জনগণের সম্পদ। অর্থাৎ এ খাতের উৎপাদন, বণ্টন ও বিতরণব্যবস্থা ও প্রণালি রাষ্ট্রের মালিকাধীন থাকতে হবে। অথচ সংস্কারের ফলে তা থাকেনি। উৎপাদনব্যবস্থা ও প্রণালির মতোই বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ ও বণ্টন রাষ্ট্র তথা জনগণের মালিকানা থেকে ব্যক্তিমালিকানায় পর্যায়ক্রমে চলে যাচ্ছে। সম্পদের মালিকানা যেন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে না যায়, সেজন্য এসব কোম্পানির শেয়ার বিক্রি নিষিদ্ধ করা জরুরি। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যক্তিখাত ও সরকারের খাতের মধ্যে সমতা নিশ্চিতকরণ নীতিমালা নেই।

১১. উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা বা কোম্পানির দক্ষতা মানসম্মত নয়। ফলে বিতরণ ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। এই দায়ও ভোক্তাদের কাঁধেই চেপেছে। তাই এসব কোম্পানিকে কেবল বিদ্যুৎ কেনাবেচার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেমনা থাকা প্রয়োজন।

১২. বিদ্যুৎ খাতে সরকারের নীতির প্রতিফলন দৃশ্যমান হয় নিম্নোক্ত বাস্তবতার মধ্য দিয়ে–

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বৃহৎ শিল্পের তুলনায় অধিক মূল্যেও বিদ্যুৎ পায় না।
- ব্যক্তি খাত ভর্তুকিতে চাহিদামতো নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস পেলেও সরকারি খাত (পিডিবি) বেশি দাম দিয়েও গ্যাস পায় না।
- ফুটপাতের পান-বিড়ির দোকানকে অধিক দামে বিদ্যুৎ কিনতে হয়।
- গ্রামের প্রান্তিক গ্রাহককে শহরের তুলনায় অধিক দামে বিদ্যুৎ কিনেও বেশি বেশি লোডশেডিংয়ে থাকতে হয়।

১৩. এ পরিস্থিতি দেখিয়ে দেয় যে, এই খাত ভোক্তাবান্ধব নীতিতে চালিত হচ্ছে না।

১৪. সরকারি বিনিয়োগ কমানোর অজুহাতে বিশ্বব্যাংকের চাপে ব্যক্তি মালিকানায় প্রথম ব্যক্তি খাত

বিনিয়োগে উৎপাদিত আইপিপির বিদ্যুৎ কেনা শুরু হয়। তাতে ব্যক্তি খাত পর্যাপ্ত মুনাফা করে। ফলে আর্থিক ঘাটতি বাড়ায় বিদ্যুতের মূল্যবদ্ধি ঘটে। সরকারের ভুল নীতির দায় বহন করতে হয় ভোক্তাকে।

১৫. বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগ্রাহক ভর্তুকি সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প তা পাচ্ছে না। বাণিজ্যিক গ্রাহকের ক্ষেত্রে সব গ্রাহকের জন্য বিদ্যুতের দামের হার একই। পানের দোকানদার যে কিনা একটা বাতি জ্বালায় অথবা ছোট একটা ফ্যান চালায়, তাকে প্রতি ইউনিটের জন্য যে দাম দিতে হয়, বসুন্ধরার মতো অল এয়ারকন্ডিশন্ড বড় মার্কেটে যিনি ব্যবসা করছেন, তিনিও সেই একই দাম দেন। বিদ্যুতের দামের হার বিন্যাসের ক্ষেত্রে ও এক চরম বৈষম্য। গ্রামের লাইফ লাইন গ্রাহকরা শহরের লাইফ লাইন গ্রাহকের তুলনায় বিদ্যুতের দাম বেশি পরিশোধ করেন। এসব বৈষম্য দূর করা দরকার। নীতিমালায় পরিবর্তন জরুরি।

১৬. বিইআরসি আইনে জ্বালানি তেলের মূল্য বছরে একবার পুনর্নির্ধারণের বিধান রাখা ছিল। এ বিধান বিদ্যুতের মূল্যের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। ২০১১ সালে দেখা যায়, এক বছরে চারবার বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি বিইআরসি করেছে। পরবর্তীকালে সরকার আইন সংশোধন করে বছরে একাধিকবার মূল্যবৃদ্ধির ধারা যুক্ত করেছে। যা কিনা ভোক্তা অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে আইনের উদ্দেশ্যকেই বিনষ্ট করে দিয়েছে।

১৭. উৎপাদন-অনুৎপাদন খাতগুলো এবং সরকারি-বেসরকারি খাতগুলোতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ বণ্টন নীতি নিশ্চিত করে সে নীতি বাস্তবায়নের কৌশল বিইআরসি যদি স্থির না করে, তাহলে বিদ্যুৎ খাত অসাধু ব্যবসামুক্ত হবে না। ভোক্তাস্বার্থও সুরক্ষিত হবে না। বণ্টন ও বিতরণের পাশাপাশি ভোক্তাভেদে গ্যাস, তরল জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ নীতি এবং তার বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন ভোক্তাস্বার্থে বিইআরসিকে বিবেচনায় নিতে হবে।

১৮. ব্যক্তিখাত আমদানীকৃত জ্বালানি তেলের বিল মাত্রাতিরিক্ত মূল্যহারে পরিশোধ হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, এ মূল্যহার অযৌক্তিক, অন্যায্য ও সামঞ্জস্যহীন। এ অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের দাবি করা হলেও তা হয়নি। বরং অতি সম্প্রতি ব্যক্তি খাতকে সরাসরি জ্বালানি আমদানি ও বাজারজাতকরণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

নীতি ও বিধিমালার ক্ষেত্রে জ্বালানি রূপান্তর নীতির দিকনির্দেশনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

৭.১.১. প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের ১৪৩ ও ১৩ অনুচ্ছেদ মতে জ্বালানি ও জ্বালানিজাত পণ্যের ওপর জনগণের মালিকানা বা স্বত্বাধিকার নিশ্চিত হতে হবে।

৭.২.১. জ্বালানি উৎপাদন, বিতরণ ও বণ্টনে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি ইউটিলিটির পরিচালনা নীতি ও কৌশল সমতাভিত্তিক হতে হবে।

৭.২.২. ভোক্তা যেন ন্যায্য ও যৌক্তিক মূল্যে মানসম্মত জ্বালানি সেবা পায়, সেজন্য উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, বণ্টন ও বিপণনসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.২.৩. জ্বালানি সম্পদ ব্যবহারে সর্বস্তরের মানুষের জন্য সুষম সুযোগ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.২.৫. জ্বালানি বঞ্চিত প্রান্তিক জনগণের জীবনমান উন্নয়নে জ্বালানির ওপর তাদের স্বত্বাধিকার নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৪.৪. মন্ত্রণালয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

৭.৬.৪. জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহ শতভাগ জনগণের মালিকানায় নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৬.৬. সরকারি মালিকানাধীন এনার্জি ইউটিলিটির শেয়ার ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর নিষিদ্ধ হতে হবে। শতভাগ মালিকানা জনগণের নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৬.৭. সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠার দ্বারা জ্বালানি খাতকে লেভেল প্লেইং ফিল্ড- এ পরিণত করতে হবে।

৭.৬.৮. জ্বালানি সেবা স্বার্থসংঘাত মুক্ত হতে হবে।

৭.৭.২. সরকারি ও ব্যক্তি উভয় খাতে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান ও উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি আমদানি রেগুলেটরি সিস্টেমের আওতাভুক্ত হতে হবে।

৭.৭.৫. মন্ত্রণালয়কে শুধুমাত্র বিধি প্রণয়ন এবং আইন, বিধি ও রেগুলেটরি আদেশসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নজরদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

৭.৮.১. সরকারের অধীনে জ্বালানি উন্নয়নে ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ এবং সম্পৃক্ততা উৎসাহিত ও সম্প্রসারিত হতে পারে, তবে মালিকানার বিনিময়ে নয়।

৭.৮.২. গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল, ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলের অর্থ জ্বালানি অনুসন্ধান/উৎপাদন/আমদানীতে অনুদান হিসেবে ইকুইটি বিনিয়োগ হতে হবে।

৭.৮.৫. স্থলভাগের গ্যাসক্ষেত্রের শতভাগ উন্নয়ন কেবলমাত্র দেশীয় কোম্পানি দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৮.১০. গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল ও জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং ব্যবস্থাপনায় ভোক্তা প্রতিনীধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৮.১১. পিএসসি'র আওতায় তেল/গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীর ভাগের সমূদয় তেল/ গ্যাস সরকারের জন্য ক্রয় করা বাধ্যতামূলক হতে হবে।

৭.৮.১৩. বাণিজ্যিক ঋণে বিওওটি বেসিসে জ্বালানিখাত উন্নয়ন রহিত হতে হবে।

৭.৮.১৪. জ্বালানি খাতে সরকার ব্যক্তিখাতের সাথে যৌথ মালিকানায় কোনভাবেই ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত হবে না এবং সরকারি মালিকানাধীন কোন কোম্পানীর শেয়ার ব্যাক্তি খাতে হস্তান্তর হবে না, নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৯.১. তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত দেশীয় তিনটি কোম্পানি একীভূত হয়ে একটি জাতীয় কোম্পানি গঠিত হতে হবে।

৭.৯.২. নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়নে পেট্রোবাংলা/বিপিডিবির অনুরূপ স্রেডাকে স্ব-শাসিত সংস্থায় পরিণত হতে হবে। এ খাত উন্নয়নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি খাত উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে এবং সক্ষম উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ থাকতে হবে।

৭.৯.৩. বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থা বিভাজন করে সরকারি মালিকানাধীনে পিডিবি'র আওতায় গ্যাসখাতের অনুরূপ ইউটিলিটি কোম্পানি গঠন/পূণর্গঠন সম্পন্ন হতে হবে।

৭.৯.৪. জ্বালানি তেল, গ্যাস, কয়লা, ও বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানিসমূহের পরিচালনার ব্যাপারে স্ব স্ব পরিচালনা বোর্ড মন্ত্রণালয় কিংবা নিয়ন্ত্রণক সংস্থার (বিপিসি, পেট্রোবাংলা, অথবা বিপিডিবি) প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত হতে হবে।

৭.৯.৭. নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মন্ত্রী পরিষদ ও পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা মূখ্য হতে হবে।

৭.৯.৮. সকল প্রকার ক্রয় প্রক্রিয়ায় ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী কর্তৃত্ব রহিত হতে হবে।

৭.৯.৯. জ্বালানি খাত প্রশাসন ভোক্তাদের নজরদারির আওতায় আনার লক্ষ্যে ক্যাবের উদ্যোগে জাতীয় জ্বালানি টাস্কফোর্স গঠিক হতে হবে।

৭.১০.১. জ্বালানী সরবরাহ ও ব্যবহারে জ্বালানি সাশ্রয়ী কৌশলসমূহ আইন দ্বারা বলবৎ যোগ্য হতে হবে।

৭.১১.১. জ্বালানি খাতে কারিগরি দক্ষ জনবলের ঘাটতি পূরণের জন্য দক্ষতা মূল্যায়ণের ভিত্তিতে প্রণোদনা ও পদোন্নতির বিধান থাকতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১১.২. পেশাগত দক্ষতা যাচাই ও উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া থাকতে হবে।

৭.১১.৩. ভোক্তা, ইউটিলিটি, রেগুলেটরি, পলিসি ও পরিকল্পনা পর্যায়ে জ্বালানি রূপান্তরের প্রভাবের ওপর নিয়মিত গবেষণা ও অনুশীলন হতে হবে।

৭.১১.৪. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জ্বালানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষনা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। এ ব্যাপারে ক্যাব ও ইপিআরসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭.১১.৫. প্রশিক্ষণের ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীকে বিদেশে পাঠানোর পরিবর্তে বিদেশী বিশেষায়িত প্রশিক্ষকের দ্বারা দেশে প্রশিক্ষণ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১১.৬. শিল্প কারখানা ও বিভিন্ন সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট/কেন্দ্রসমূহকে জ্বালানি রূপান্তর কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে এবং তাদের স্ব-ক্ষমতা উন্নয়ন হতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠান ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জনে শিল্প খাতে আবশ্যকীয় জনবল তৈরিতে সহায়ক হবে। এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোন কোন ব্যবহারিক কোর্সের জন্য আউট-সোর্সিং হিসেবে ব্যবহার হতে হবে এবং জনস্বার্থে সম্পদের শতভাগ ব্যাবহার নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১২.১. রূপকল্প বিবেচনায় রেখে জ্বালানি খাতের বিদ্যমান প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রিভিউ হতে হবে। প্রস্তাবিত এই জ্বালানি রূপান্তর নীতির ভিত্তিতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন করতে হবে।

৭.১২.২. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় কৃষির অনুরূপ জ্বালানিতেও সরকারি বিনিয়োগ মূখ্য হতে হবে।

৭.১২.৩. জ্বালানি খাত উন্নয়ন বাজেটে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতই অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।

৭.১২.৪. অনুসন্ধান/উৎপাদন, সঞ্চালন/পরিবহন, বিতরণ ক্ষমতা উন্নয়ন পরিকল্পনা, চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে হতে হবে। বাজেটে বরাদ্দও তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৭.১২.৫. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক তিন মাস অন্তর অন্তর ভোক্তা সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হতে হবে। জ্বালানী টাস্কফোর্স পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন নিয়মিত পরিকল্পনা কমিশনসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে দেবে।

৭.১২.৬. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও প্যারিস চুক্তির সাথে জ্বালানি রূপান্তর সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং সে লক্ষ্যে সকল আইন, বিধি-বিধান এবং নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা আমূল পরিবর্তন হতে হবে।

৭.৮.১. সরকারের অধীনে জ্বালানি উন্নয়নে ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ এবং সম্পৃক্ততা উৎসাহিত ও সম্প্রসারিত হতে পারে, তবে মালিকানার বিনিময়ে নয়।

৭.৮.২. গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল, ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলের অর্থ জ্বালানি অনুসন্ধান/উৎপাদন/আমদানীতে অনুদান হিসেবে ইকুইটি বিনিয়োগ হতে হবে।

৭.৮.৫. স্থলভাগের গ্যাসক্ষেত্রের শতভাগ উন্নয়ন কেবলমাত্র দেশীয় কোম্পানি দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৮.১০. গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল ও জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং ব্যবস্থাপনায় ভোক্তা প্রতিনীধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৮.১১. পিএসসি'র আওতায় তেল/গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীর ভাগের সমূদয় তেল/ গ্যাস সরকারের জন্য ক্রয় করা বাধ্যতামূলক হতে হবে।

৭.৮.১৩. বাণিজ্যিক ঋণে বিওওটি বেসিসে জ্বালানিখাত উন্নয়ন রহিত হতে হবে।

৭.৮.১৪. জ্বালানি খাতে সরকার ব্যক্তিখাতের সাথে যৌথ মালিকানায় কোনভাবেই ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত হবে না এবং সরকারি মালিকানাধীন কোন কোম্পানীর শেয়ার ব্যাক্তি খাতে হস্তান্তর হবে না, নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৯.১. তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত দেশীয় তিনটি কোম্পানি একীভূত হয়ে একটি জাতীয় কোম্পানি গঠিত হতে হবে।

৭.৯.২. নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়নে পেট্রোবাংলা/বিপিডিবির অনুরূপ স্রেডাকে স্ব-শাসিত সংস্থায় পরিণত হতে হবে। এ খাত উন্নয়নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি খাত উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে এবং সক্ষম উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ থাকতে হবে।

৭.৯.৩. বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থা বিভাজন করে সরকারি মালিকানাধীনে পিডিবি'র আওতায় গ্যাসখাতের অনুরূপ ইউটিলিটি কোম্পানি গঠন/পূণর্গঠন সম্পন্ন হতে হবে।

৭.৯.৪. জ্বালানি তেল, গ্যাস, কয়লা, ও বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানিসমূহের পরিচালনার ব্যাপারে স্ব স্ব পরিচালনা বোর্ড মন্ত্রণালয় কিংবা নিয়ন্ত্রণক সংস্থার (বিপিসি, পেট্রোবাংলা, অথবা বিপিডিবি) প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত হতে হবে।

৭.৯.৭. নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মন্ত্রী পরিষদ ও পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা মূখ্য হতে হবে।

৭.৯.৮. সকল প্রকার ক্রয় প্রক্রিয়ায় ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী কর্তৃত্ব রহিত হতে হবে।

৭.৯.৯. জ্বালানি খাত প্রশাসন ভোক্তাদের নজরদারির আওতায় আনার লক্ষ্যে ক্যাবের উদ্যোগে জাতীয় জ্বালানি টাস্কফোর্স গঠিক হতে হবে।

৭.১০.১. জ্বালানী সরবরাহ ও ব্যবহারে জ্বালানি সাশ্রয়ী কৌশলসমূহ আইন দ্বারা বলবৎ যোগ্য হতে হবে।

৭.১১.১. জ্বালানি খাতে কারিগরি দক্ষ জনবলের ঘাটতি পূরণের জন্য দক্ষতা মূল্যায়ণের ভিত্তিতে প্রণোদনা ও পদোন্নতির বিধান থাকতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১১.২. পেশাগত দক্ষতা যাচাই ও উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া থাকতে হবে।

৭.১১.৩. ভোক্তা, ইউটিলিটি, রেগুলেটরি, পলিসি ও পরিকল্পনা পর্যায়ে জ্বালানি রূপান্তরের প্রভাবের ওপর নিয়মিত গবেষণা ও অনুশীলন হতে হবে।

৭.১১.৪. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জ্বালানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষনা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। এ ব্যাপারে ক্যাব ও ইপিআরসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭.১১.৫. প্রশিক্ষণের ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীকে বিদেশে পাঠানোর পরিবর্তে বিদেশী বিশেষায়িত প্রশিক্ষকের দ্বারা দেশে প্রশিক্ষণ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১১.৬. শিল্প কারখানা ও বিভিন্ন সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট/কেন্দ্রসমূহকে জ্বালানি রূপান্তর কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে এবং তাদের স্ব-ক্ষমতা উন্নয়ন হতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠান ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জনে শিল্প খাতে আবশ্যকীয় জনবল তৈরিতে সহায়ক হবে। এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষার্থীদের কোন কোন ব্যবহারিক কোর্সের জন্য আউট-সোর্সিং হিসেবে ব্যবহার হতে হবে এবং জনস্বার্থে সম্পদের শতভাগ ব্যাবহার নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১২.১. রূপকল্প বিবেচনায় রেখে জ্বালানি খাতের বিদ্যমান প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রিভিউ হতে হবে। প্রস্তাবিত এই জ্বালানি রূপান্তর নীতির ভিত্তিতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন করতে হবে।

৭.১২.২. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় কৃষির অনুরূপ জ্বালানিতেও সরকারি বিনিয়োগ মূখ্য হতে হবে।

৭.১২.৩. জ্বালানি খাত উন্নয়ন বাজেটে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতই অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।

৭.১২.৪. অনুসন্ধান/উৎপাদন, সঞ্চালন/পরিবহন, বিতরণ ক্ষমতা উন্নয়ন পরিকল্পনা, চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে হতে হবে। বাজেটে বরাদ্দও তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৭.১২.৫. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক তিন মাস অন্তর অন্তর ভোক্তা সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হতে হবে। জ্বালানী টাস্কফোর্স পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন নিয়মিত পরিকল্পনা কমিশনসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে দেবে।

৭.১২.৬. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও প্যারিস চুক্তির সাথে জ্বালানি রূপান্তর সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং সে লক্ষ্যে সকল আইন, বিধি-বিধান এবং নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা আমূল পরিবর্তন হতে হবে।

৭.১৩.১. জ্বালানিখাত উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশসংরক্ষণ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১৩.২. সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার হিসেবে রাষ্ট্র জীবন রক্ষার যে নিশ্চয়তা দিয়েছে, জ্বালানিখাত উন্নয়নে পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতির কারণে সে অধিকার যেন খর্ব/ক্ষুণ্ন না হয়, তা নিশ্চিত হতে হবে এবং ১৮(১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ ও ইকো-সিস্টেম সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, তা নিশ্চিতকরণে শিক্ষার্থী ও ভোক্তা সাধারণের সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে হবে।

৭.১৩.৪. এ প্রশ্নে আইন, বাণিজ্য, ও রাজনীতির মধ্যে ভারসাম্যমূলক কৌশলগত সম্পর্ক তৈরি হতে হবে।

৭.১৩.৫. জ্বালানিখাত পরিচালনায় নির্গত বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন প্রশমন করার কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১৪.১. জ্বালানিখাত পরিচালনা ও উন্নয়নে এ যাবৎকাল যেসব নীতি, আইন, বিধি ও বিধান প্রণীত হয়েছে, তা জনস্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন হতে হবে।

৭.১৪.২. এখাতে দেশী বিদেশী ব্যক্তিখাতের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ জনস্বার্থ বিরোধী কি-না তা খতিয়ে দেখে সে সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

৭.১৪.৩. জ্বালানি উন্নয়নে সম্পাদিত চুক্তি বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে নির্ধারিত মডেল চুক্তি থাকতে হবে।

৭.১৪.৪. কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জ্বালানিখাতে আর্থিকভাবে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সব নাগরিকদের সমন্বয়ে ক্যাব কর্তৃক জাতীয় জ্বালানি টাস্কফোর্স গঠিত হতে হবে।

জ্বালানি খাতে লুণ্ঠনমূলক মূল্যবৃদ্ধিঃ বিইআরসির আদেশ পর্যালোচনা ২০০৯-২০২১

অনুসন্ধানে এই সময়পর্বে বিইআরসি প্রদত্ত ১০৫টি আদেশ পর্যালোচনাধীনে নেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

- বিদ্যুৎ খাত ২০০৯: ৬টি
- জ্বালানি খাত ২০০৯: ৩টি
- বিদ্যুৎ খাত ২০১০: ৫টি
- বিদ্যুৎ খাত ২০১১: ৮টি
- জ্বালানি খাত ২০১১: ৩টি
- বিদ্যুৎ খাত ২০১২: ৯টি
- জ্বালানি খাত ২০১২: ১টি
- বিদ্যুৎ খাত ২০১৩: ১টি
- বিদ্যুৎ খাত ২০১৪: ৫টি
- বিদ্যুৎ খাত ২০১৫: ৬টি
- জ্বালানি খাত ২০১৫: ৬টি
- বিদ্যুৎ খাত ২০১৭: ৭টি
- জ্বালানি খাত ২০১৭: ৮টি
- জ্বালানি খাত ২০১৮: ৭টি
- জ্বালানি খাত ২০১৯: ৭টি
- বিদ্যুৎ খাত ২০২০: ১৪টি
- জ্বালানি খাত ২০২১: ৯টি

মূল্যহার সম্পর্কিত জ্বালানি রূপান্তর নীতির দিকনির্দেশনা

৭.৫.১. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণ বিদ্যমান পদ্ধতি তথা প্রবিধানমালা সংশোধন হতে হবে।

৭.৫.২. জ্বালানি ভেদে সরকারি ও ব্যক্তি খাতভিত্তিক জ্বালানির বাল্ক মূল্যহার নির্ধারণ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি হতে হবে।

৭.৫.৩. বিদ্যমান মূল্যহার বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষি, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান (এসি ব্যতীত) এবং প্রান্তিক আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভোক্তার জ্বালানি সেবার বিদ্যমান মূল্যহারে রিভিউ হতে হবে।

৭.৫.৪. বাণিজ্য ও শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে কস্টপ্লাস নীতির ভিত্তিতে মূল্যহার নির্ধারিত হবে। তবে তাদের ক্ষেত্রে যেসব আর্থিক প্রণোদনা রয়েছে, সেসব প্রণোদনা বিদেশী ব্যক্তিখাতের প্রাপ্ত প্রণোদনার সাথে যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৫.৫. ভর্তুকি বিইআরসি কর্তৃক প্রণিত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৭.৫.৬. দেশী শিল্প ও রপ্তানিমুখী বিদেশী শিল্পে ব্যবহৃত গ্যাসের মান ও মূল্যহারে বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন হতে হবে।

৭.৫.৭. বাণিজ্যিক ও এসি আবাসিক গ্রাহকসহ বিভিন্ন বিনোদন এবং বিলাসী ও আয়েসী জীবন যাপনে ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্যহার বাণিজ্যিক মূল্যহারে নির্ধারিত হতে হবে।

৭.৫.৮. গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত যানবাহনে ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্যহার পৃথক হতে হবে।

৭.৫.৯. প্রান্তিক ভোক্তার ক্ষেত্রে রান্নায় ব্যবহৃত এলপিজি ও গ্যাসের মূল্যহার বিদ্যুতের অনুরূপ ক্রয়ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

বিইআরসির আদেশ পর্যালোচনা ২০০৯-২০২১

১. ব্যক্তিখাত নিজ উদ্যোগে জ্বালানি সংগ্রহ ও ক্রেতা সংগ্রহ করে না। সরকার ব্যক্তিখাতে ভর্তুকিমূল্যে জ্বালানি সরবরাহ করে এবং তাদের উৎপাদিত বিদ্যুৎ চড়া দামে কেনে। এটা বিদ্যুৎখাতে জনগণের অর্থ লুণ্ঠনের পথ খুলে দিয়েছে।

২. বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত তেল, গ্যাস ভ্যাট ও শুল্কমুক্ত নয়। এই ভ্যাট ও শুল্কের কারণে উৎপাদনের ব্যয় বাড়ছে। যা আসলে মুনাফা আকারে সরকারের হাতে যাচ্ছে। ফলে সরকার ভর্তুকির যে চিত্র প্রদর্শন করছে, তা আদতে সঠিক নয়। ভ্যাট ও শুল্ক প্রত্যাহার করে নিলে ভর্তুকির পরিমাণ এমনিতেই কমে যাবে। কিন্তু সরকার তা না করে উচ্চ ভর্তুকি দেখিয়ে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করছে।

৩. অযৌক্তিক মূল্যহার বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ওপর জনগণের মালিকানাকে অনিশ্চিত করে তোলে। কারণ মূল্যবৃদ্ধির কারণে জনগণ তা নিশ্চিতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন ব্যাহত হচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি তাই একইসঙ্গে টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তার অন্তরায়।

৪. বিইআরসি আইন উপেক্ষা করে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অরবিটারিলি তেলের দাম বৃদ্ধি একদিকে যেমন আইনের লঙ্ঘন, আরেকদিকে এটা স্বেচ্ছাচারিতা ও জবাবদিহিহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যা জ্বালানি খাতকে নীতিহীন, অপরিকল্পিত উন্নয়নের পথে চালিত করছে।

৫. গণশুনানির ঘটনা পরিক্রমায় প্রমাণিত যে, সম্ভাব্য ধারণাগত তথ্য উপাত্ত বিবেচনায় নিয়ে কমিশন দাম বাড়ায়। এমনকি ভবিষ্যতে দাম বাড়তে পারে এমন বিবেচনাকে ভিত্তি করেও দাম বাড়ানো হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব শুনানিতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ না হলেও ত্রুটিপূর্ণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে।

৬. ১৬ই জুলাই ২০১২ কমিশনে এক গনশুনানিতে ভোক্তা পিডিবি ও কমিশনের মূল্যায়ন কমিটি একমত হয় যে ভাড়া প্লান্টের বিদ্যুৎ এ খাতের মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক। বিদ্যুৎ উৎপাদন হোক বা না হোক ক্যাপাসিটি পেমেন্ট বাবদ বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। তাই এসব প্লান্টের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না। কিন্তু এই মতের প্রতিফলন পরে বিআরসির আদেশে যুক্ত হয়নি ফলে তা কার্যকর হয়নি।

৭. ২০০২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিপিসি সরকারি কোষাগারে দেয় ২৫ হাজার কোটি টাকা। আর লোকসান দেখায় ২৬ হাজার কোটি টাকা। এ লোকসান পূরণের নিমিত্তে মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো হয়। অথচ সরকারি কোষাগারে দেয়া অর্থকে সমন্বয় করে দিলে এখানে মাত্র ১ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি থাকত। কিন্তু তা না করে লোকসান দেখিয়ে মূল্যবৃদ্ধির জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ নেয়া হয়।

৮. গ্যাস খাত লাভে থাকলেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। আর এটা করার উদ্দেশ্যেই বিআরসিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

৯. ২০১১ সালের ৬ মে থেকে ২০১৩ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত পাঁচবার জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে বিইআরসি আইন উপেক্ষা করেই।

১০. ২০১২ সালে ৫৮ হাজার অবৈধ গ্যাস সংযোগ প্রমাণিত হলেও দায়ীদের শাস্তি দেয়া যায়নি। সরকার আইন বিধি সুবিচার নিশ্চিতে ব্যর্থ হয়েছে।

১১. রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানির প্রোফিট মার্জিন মুনাফামুখী। ফলে এটা জনস্বার্থের পরিপন্থী। এটা সেবাদানের চেয়ে আয় বাড়ানোর কৌশলকে বেশি গুরুত্ব দিতে প্রলুব্ধ করে।

১২. দেখা গেছে, যেসব কোম্পানির মুনাফা মার্জিন লাভজনক, যারা লাভে আছে তারা মুনাফা পেয়ে অপরিকল্পিত উন্নয়ন ব্যয় বাড়িয়েছে। কেউ কেউ বেতন বৃদ্ধি করেছে এবং এসব ব্যয় সমন্বয়ের জন্য বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব এনেছে। যাদের মুনাফা নেই, তাদের এসব ব্যয় বাড়েনি।

১৩. ২০১৫ সালের শুরুতে আলোচনায় আসে আশুগঞ্জ পাওয়ার কোম্পানি ও ইজিসিবিএল– এই দুটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানির মুনাফা মার্জিন বাড়ানো সিদ্ধান্ত দিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ। এ দুটি কোম্পানির বোর্ড চেয়ারম্যান ছিলেন মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তা। তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ তথা মন্ত্রণালয় ওই সিদ্ধান্ত দিলেও অমন সিদ্ধান্তের এখতিয়ার কেবলমাত্র বিইআরসির।

১৪. স্বল্প দামে তথা সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিইআরসির নির্দেশনা মন্ত্রণালয় কখনোই পালন করেনি। কারণ তাদের নীতি হলো বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ব্যক্তি খাতের প্রসার। যা দেখা যায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। এখানে সরকারের নীতি ও বিদ্যমান আইনের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা যায়।

১৫. বিইআরসি আইনের অধীনে ভোক্তাপক্ষের অভিযোগ নিষ্পত্তির নিমিত্তে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা বা বিধিমালা থাকা প্রয়োজন। সামিট পাওয়ারের সঙ্গে ২০১১ সালের ১২ মে সম্পাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি অসাধু উপায়ে ৩ আগস্ট ২০১১ তারিখে সংশোধন করে সামিট পাওয়ারকে লাভবান করা হয়। এটা বিইআরসিকে তদন্তের অনুরোধ জানালেও তারা তা করেনি।

১৬. প্রতিবছর গ্যাস খাত থেকে সরকার রাজস্ব পায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে আসে সুদসহ এক হাজার কোটি টাকার বেশি। পেট্রোবাংলাসহ ইউটিলিটিগুলোর প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা ব্যাংকে এফডিআর হিসেবে অলস পড়ে আছে। প্রয়োজনের তুলনায় তারা মার্জিন পায় দু-তিন গুণ বেশি। বিদ্যুৎ খাতেও এমন অলস অর্থ রয়েছে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। জ্বালানি তেল ও কয়লা খাতেও এমন অর্থ রয়েছে। এসব অর্থ (প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে বিনিয়োগের উদ্যোগ নেই। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিজনিত ওই অর্থ বিদ্যমান আইনে বিনিয়োগের সুযোগ নেই। এসব অর্থ ভোক্তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক নেয়া হয়েছে।

১৭. ইউটিলিটিতে চাহিদার সঙ্গে জনবল নিয়োগ সামঞ্জস্যহীন। ওভার টাইম বিল যৌক্তিক নয়। প্রশাসন, সিবিএ দ্বারা প্রভাবিত। সেই প্রভাবে ঠিকাদার প্রভাবক। সিবিএ, ঠিকাদার ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত প্রশাসন মিলেমিশে চালায়। ফলে গ্যাস চুরি, অবৈধ সংযোগ ও সামঞ্জস্যহীন উন্নয়নব্যয় নিয়ন্ত্রণহীন। ইউটিলিটির পরিচালনা বোর্ডে চেয়ারম্যানসহ সদস্যদের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগের কর্মকর্তারা সংখ্যায় অধিক। তাদের কারণে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত দুর্নীতিমুক্ত হয় না।

১৮. ২০১৪ সালে দেখা যায়, বিশ্ববাজারে ক্রমাগত জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও বেশি বেশি তেলের দামহার বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং আর্থিক ঘাটতি সমন্বয় হয়েছে। তেলের দামহার বাড়ায় উৎপাদন ব্যয়হার বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্যুতেও আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। সে আর্থিক ঘাটতি সমন্বয়ের জন্য বিদ্যুতের দামহারও বাড়ানো হয়। যখনই জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে, তখনই বিদ্যুতের দামও বেড়েছে। কিন্তু ২০১৪ সালে যখন দেখা গেল দীর্ঘদিন ধরে তেলের দরপতন অব্যাহত আছে, ব্যারেলপ্রতি বিশ্ববাজারে পণ্যটির দাম যখন ১২০ ডলার থেকে নেমে ৪০ ডলার হলো, তখনো

দেখা গেল দাম সমন্বয় হয়নি। সে সময় দাম বেড়ে ফার্নেস অয়েল ৬০ টাকা এবং ডিজেল ৬৮ টাকা হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক বাজারে দাম পড়ে গেলেও দেশে দাম ওই একই জায়গায় স্থির ছিল।

১৯. ২০১৪ সালে দেখা যায়, মন্ত্রণালয়ের চাপের মুখে বিইআরসি/কমিশন বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দামহার বৃদ্ধির প্রস্তাবগুলোর ওপর অতি দ্রুত ও স্বল্পতম সময়ে গণশুনানি করে। দামহার বৃদ্ধি হবে এবং ভূতাপেক্ষভাবে এ বৃদ্ধির আদেশ ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হবে- এ তথ্য বিইআরসির প্রতিনিধি গণমাধ্যমকে শুনানি চলাকালেই অবহিত করেন।

২০. ২০১৪-১৫ সালে দেখা যায়, সম্পদমূল্য হিসাবে পৃথকভাবে প্রতি একক গ্যাসে ২৫ টাকা হিসাবে ভোক্তাদের কাছ থেকে বছরে দুই হাজার ২০৪ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হয়। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে পাওয়া যায় সুদসহ এক হাজার কোটি টাকা। শুল্কভ্যাট, করপোরেট কর ও ডিভিডেন্ড বাবদ সরকার পায় প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানির নামে এফডিআর হিসেবে ব্যাংকে সঞ্চয় রয়েছে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানির নামেও এফডিআর হিসাবে সঞ্চয় রয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকা। এসব উৎসকে বাজেটে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে বিনিয়োগের উৎস গণ্য করা হলে বিদেশি বিনিয়োগ বা ব্যক্তি খাত, বিনিয়োগের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত বিনিয়োগ সংকটে থাকে না।

২১. জ্বালানি বিভাগ ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি পেট্রোবাংলার সুপারিশে জিটিসিএলের গ্যাস সঞ্চালন পয়সা থেকে বৃদ্ধি করেছে ৩২.০০ পশ্চিমাঞ্চল, বাখরাবাদ ও জালালাবাদ কোম্পানির গ্যাস বিতরণ মার্জিন ২০১২ সালের ১ জুলাই বিদ্যুৎ ও সিএনজিতে বৃদ্ধি করেছে যথাক্রমে ২২.৫০ থেকে ২৯.২৫ এবং ১৫.৬০ থেকে ২০.২৪ টাকা। বিতরণ মার্জিন পুনর্নির্ধারণের এখতিয়ার বিইআরসি আইন মতে, কেবল বিইআরসির, পেট্রোবংলা বা জ্বালানি বিভাগের নয়। এক্ষেত্রে বিইআরসি আইন লঙ্ঘন করে পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি বিভাগ গ্যাস খাত শাসনে অবৈধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিতরণ মার্জিন বা আয়হার বৃদ্ধি করা হলে অন্যান্য কোম্পানির বিতরণ মার্জিনের সঙ্গে সমতা যেমন বিঘ্নিত হয়, সে সমতা রক্ষায় গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রেও সে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবে যুক্তি হয়ে এসেছে। যদিও কোম্পানিগুলোর রেভিনিউ উদ্বৃত্ত থাকে প্রচুর।

২২. বিদ্যুৎ খাতের স্ব-স্ব কোম্পানি বা সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের অংশবিশেষ ঠিকাদারের বিল পরিশোধ ও কোম্পানির শেয়ার বিক্রির প্রতি মনোযোগী বেশি। তারা সেখানকার নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি বাণিজ্যে জড়িত। তাদের নিজেদের কর্মদক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নে নজর নেই।

২৩. যেসব রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল প্লান্টের মেয়াদ বৃদ্ধি বা নবায়ন হয়েছে, যুক্তি হিসেবে সেসব প্লান্টের বিদ্যুতের ক্রয়মূল্য হ্রাসকে যুক্তি হিসেবে আনা হয়েছে। কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অভিযোগ করা হয়েছে, বাস্তবে এ মূল্য হ্রাসের কোনো কার্যকারিতা নেই। ক্যাপাসিটি পেমেন্ট হিসাবে প্রতি কিলোওয়াটে যে মাসুল ছিল, এখনো তা অপরিবর্তিত রয়েছে। ন্যূনতম প্লান্ট ফ্যাক্টর ও হিট রেট বেঁধে দেওয়া হয়নি। ফলে বিষয়টি প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ভোক্তারা অসাধু ব্যবসার শিকার হয়েছে।

২৪. ব্যক্তি খাতে বাণিজ্যিক ও ক্যাপটিভ প্লান্টে গ্যাস দেওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। অথচ গ্যাস স্বল্পতার অজুহাতে সরকারি প্লান্ট গ্যাস না পেলেও ব্যক্তি খাত বাণিজ্যিক প্লান্ট ভর্তুকিতে গ্যাস পায়। সে প্লান্টের বিদ্যুৎ অধিক মূল্যহারে স্থানীয় গ্রাহক ও পিডিবিকে কিনতে হয়। এমন ব্যবসা অন্যায় ও অসাধু। এগ্রিকোর রেন্টাল গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্লান্টের বিদ্যুৎ পিডিবিকে কিনতে হয় পাঁচ টাকা মূল্যহারে। অথচ গ্যাস পেলে সে বিদ্যুৎ পিডিবি দিতে পারে ৬৩ পয়সা মূল্যে। এমন অসাধু মূল্যহারে ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জ্বালানি খাত উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

২৫. সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সামঞ্জস্যহীন। তা ছাড়া সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা স্বল্প ব্যবহৃত। তাতে অস্বচ্ছতা বাড়ায় দুর্নীতি বেড়েছে। ফলে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় হারও বেড়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যৌক্তিকভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন হয় না। কিন্তু এ ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম নিরুৎসাহিত করা হয়নি। ভোক্তাকে এর দায় বহন করতে হয়েছে।

২৬. দেখা গেল, জ্বালানি তেলের মূল্যহার বিশ্ববাজারে হ্রাস পাওয়ায় বিপিসির লোকসান সমন্বয় হয়েছে এবং মুনাফা হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত জ্বালানি তেলে সে মুনাফা সমন্বয় হলে বিদ্যুৎ আর লোকসানে থাকে না। লাভ হয়। তাতে বিদ্যুতের বিদ্যমান মূল্যহার কমানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। এমনকি ২০১৪-১৫ সাল থেকে বিদ্যুতের মূল্যহার কমানোর ব্যাপারে সরকারের প্রতিশ্রুতিও ছিল। কিন্তু কিছুদিন বাদেই বিদ্যুতের মূল্য উল্টো বাড়ানো হয়েছে।

২৭. উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা বা কোম্পানির দক্ষতা মানসম্মত নয়। ফলে বিতরণ ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। এই দায়ও ভোক্তাদের কাঁধেই চেপেছে। তাই এসব কোম্পানিকে কেবল বিদ্যুৎ কেনাবেচার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

২৮. দেখা গেছে, গ্যাস অথবা ফার্নেস অয়েল বিদ্যুৎ প্লান্ট, গ্যাস কিংবা নির্ধারিত মানের ফার্নেস অয়েল না পাওয়ায় বন্ধ থাকে। এরপর তাকে ডিজেল প্লান্টে রূপান্তর করা হয়। একটি প্লান্ট প্রথমে দ্বৈত জ্বালানিভিত্তিক হওয়া, আবার পরে ডিজেল প্লান্টে রূপান্তর হওয়া, উভয় কারণেই বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। এই ব্যয় বৃদ্ধি বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির চাপ সৃষ্টির পক্ষে ভূমিকা রাখে।

২৯. বিগত বছরগুলোতে কয়েক হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র অনুমোদন পেয়েছে, যার একটি বড় অংশ তিন-পাঁচ বছর মেয়াদি অস্থায়ী উচ্চমূল্যের তরল জ্বালানিনির্ভর রেন্টাল এবং কুইক রেন্টাল। আর্থিক ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তরল জ্বালানি স্বল্প ব্যবহার করায় এসব প্লান্টের উৎপাদনক্ষমতা, একদিকে যেমন স্বল্প ব্যবহার হয়েছে, তেমন অন্যদিকে নিম্নমানের হওয়ার কারণে কোনো কোনো প্লান্ট উৎপাদনক্ষমতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম ছিল না। ফলে ডিজেল প্লান্টগুলো গড়ে পাঁচ শতাংশ এবং ফার্নেস অয়েলগুলো গড়ে ১৫ শতাংশ প্লান্ট ফ্যাক্টরেও চলেনি। অথচ ওইসব ক্ষেত্রে প্লান্ট ফ্যাক্টর যথাক্রমে ২০ ও ৩৯ শতাংশ ধরে বিইআরসি প্রতি একক বাল্ক বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ করেছিল ৪.৭০ টাকা। বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রবৃদ্ধিতে এসব প্লান্টের মেয়াদ বৃদ্ধি অনাবশ্যক হলেও মালিকদের চাপে বৃদ্ধি হচ্ছে। ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির চাপ হ্রাস পায়নি। জনস্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে।

৩০. ২০১২ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসের প্রতি একক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, আইপিপি ২ দশমিক শূন্য ৩ টাকা, এসআইপিপি ২ দশমিক ৫৩ এবং ভাড়া-বিদ্যুৎ ২ দশমিক ৫৪ টাকা । পিডিবির ক্ষেত্রে এ ব্যয় ১ দশমিক ৯৩ টাকা। অথচ গ্যাস না দিয়ে পিডিবির উৎপাদন বন্ধ রেখে পিডিবিকে যে দামে গ্যাস দেয়া হয়, সে দামে বাণিজ্যিক প্লান্টে গ্যাস দেয়া হয়। সে গ্যাসে বাণিজ্যিক প্লান্টে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ২ দশমিক ৯৯ টাকা মূল্যহারে পিডিবি ও আরইবিকে কিনতে বাধ্য করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ। এর আগে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ছাড়াই এ প্লান্ট নির্মাণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। কোনো কারিগরি ইথিকস ও স্ট্যান্ডার্ড মানা হয়নি। বিধিবিধানে এমন সব পরিবর্তন আনা হয়েছে, যেন পিডিবি-আরইবির মতো সরকারি বিতরণ সংস্থা এ বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরে দেখা গেল, চড়া দাম দিয়েও জ্বালানি সরবরাহ করা যায়নি। পর্যাপ্ত মুনাফা দিয়েও ব্যক্তি খাতে আশানুরূপ বিনিয়োগ হয়নি। মাঝখান থেকে কিছু মানুষ আঙুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছে। আর ভোক্তারা বিরাট ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে, হয়ে চলেছে।

৩১. সরকারের ভুল নীতির ফলাফল হলো, উৎপাদন ক্ষমতা আছে অথচ বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না। তেল আছে, ব্যয় বেশি হয় বলে প্লান্ট চলছে না। গ্যাসস্বল্পতার অজুহাতেও প্লান্ট চালানো হয় না। প্রতিবারই বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ব্যাপারে উৎপাদন ব্যয় মেটানো এবং ঘাটতি মোকাবেলাকে অজুহাত হিসেবে দেখানো হচ্ছে ও দাম বাড়ছে। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং তার মান নিশ্চিতে সরকার কখনোই পদক্ষেপ নেয়নি। এভাবেই জনগণ প্রতারণার শিকার।

৩২. সরকারি কোম্পানির আওতাধীন গ্যাসক্ষেত্র থেকে ২০ কোটি ডলার ব্যয়ে খননকৃত ১০টি উৎপাদন কূপের মাধ্যমে দিনে বাড়তি ২০ কোটি ঘনফুট গ্যাস গ্রিডে যোগ করার কাজ দেয়া হয় রাশিয়ান তেল-গ্যাস কোম্পানি গাজপ্রম। কাজটি প্রতিযোগিতাহীন অযাচিত প্রস্তাবের আওতায় দেওয়া হয়। এ কাজের ব্যয়হার যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ যদিে কেবল দেশিয় কোম্পানির প্রকল্পে ব্যভহারের কথা, কিন্তু সেখান থেকে অর্থ দেয়া হয় এই প্রকল্পে। গ্যাস উৎপাদন কূপ খননে গ্যাজপ্রম নিয়েছে কূপপ্রতি দুই কোটি ডলার। বাপেক্সের ক্ষেত্রে সে ব্যয় এক কোটি ডলারের বেশি নয়। কিন্তু দেখা গেল বিনিয়োগে সফলতা নেই। গাজপ্রমের খননকৃত কোনো কূপই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনে সক্ষমতা দেখাতে পারেনি। ফলে পরিকল্পনামতো ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি নতুন উপাদন কূপ হলো। কিন্তু গ্রিডে ২০ কোটি ঘনফুট গ্যাস আসেনি। এভাবে ভোক্তার অর্থ অপচয় ও বিনষ্ট করা হয়েছে।

৩৩. আবাসিক গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রতি চুলায় গ্যাস খরচ ধরা হয় ৯২ একক। বাস্তবে গ্যাস খরচ হয় ৪৫ এককের বেশি নয়। আবার অনেক এলাকায় গ্যাস থাকে না, গ্যাসের চাপ কমে যায় বছরের নির্দিষ্ট সময়ে। ফলে চুলাপ্রতি মাসে ৪৭ একক গ্যাস হিসেবের বাইরে থেকে যায়। এ অর্থ ভোক্তার কাছ থেকে জোরপূর্বক নেয়া হয়।

৩৪. হিসাবে দেখা যায়, ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাস বিক্রি বাবদ যে আয় হয় তা থেকে সরকার পায় এসডি-ভ্যাট ৫৫ শতাংশ, লভ্যাংশ ২ শতাংশ, আগাম করপোরেট কর ৩ শতাংশ, সম্পদমূল্য মার্জিন ১৫.৯৬ শতাংশ ও জিডিএফ মার্জিন ৫.১৪ শতাংশ। মোট ৮১.১০ শতাংশ। কোম্পানির নিট মুনাফা থাকে প্রায় ৫ শতাংশ। অর্থাৎ ৮৬ শতাংশের বেশি টাকা ভোক্তা অতিরিক্ত দেয়। এই অর্থই পুঞ্জীভূত হয়ে সরকারের কোষাগারে পড়ে, বিভিন্ন তহবিলে জমা হয়। সরকার এ খাত বরাবরই লাভে ছিল, আছে। তবু ভুল তথ্য ও নীতির আলোকে নিয়মিত মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। যা কিনা অবিবেচনাপ্রসূত এবং জনগণের ওপর অত্যাচারের শামিল।

৩৫. ২০১৫ সালে গণশুনানিতে প্রমাণিত হয় বিদ্যুৎ সঞ্চালনে ঘাটতি মাত্র ১.৫৭ শতাংশ, আদেশে বৃদ্ধি করা হয় ২১ শতাংশ।

৩৬. ব্যক্তিখাত বহুদিন ধরেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি তেল আমদানির সুযোগ পাচ্ছে। সে তেলের প্রকৃত আমদানি মূল্যের সঙ্গে ওই তেলের মূল্য বাবদ পিডিবি যে বিল দিচ্ছে, তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যৌক্তিক নয়। এক্ষেত্রে সঠিক বিধান নিশ্চিত করা গেলে বিদ্যুতে আর্থিক ঘাটতি সৃষ্টি হতো না। এদিকে বিপিসি জ্বালানি তেল যে দামে পিডিবিকে দেয়, তার সঙ্গে শুল্ক-ভ্যাট যুক্ত থাকে এবং যে আমদানি মূল্য তারা দেখায়, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম তার চেয়ে কম থাকে। এরকম নানা পর্যায়ে ব্যয়হার যা দেখানো হয়, বাস্তবে তা সমন্বয়করার সুযোগ রয়েছে। অথচ উচ্চ ব্যয় দেখায় প্রতিটি পক্ষ এবং মন্ত্রণালয় ও বিইআরসি তা অনুমোদন করে। এতে করে বিদ্যুতের দাম বাড়ে এবং ভোক্তা তার দায় বহন করে।

৩৭. ২০১৯ সালে দেখা যায় বিইআরসির আদেশে বিইআরসি আইন উপেক্ষিত। তিতাসের ক্ষেত্রে সিস্টেমলস সুবিধা ২ শতাংশ, অন্যদের ক্ষেত্রে তা নয়। আবার পরিশোধিত মূলধনে অন্যদের লভ্যাংশ ১২ শতাংশ অথচ তিতাসের ক্ষেত্রে তা ১৮ শতাংশ। বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল গাইডলাইন পরিবর্তন করে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় রেগুলেটরিকে।

৩৮. ২০১৯ সালে গণশুনানিতে প্রমাণ মেলে, উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে যৌক্তিক ব্যয় ও চাহিদা অপেক্ষা অধিক ব্যয়বৃদ্ধি ও অধিক সম্পদ (১০ বছরে ৪ থেকে ১৪ হাজার কোটি টাকার সম্পদ) অর্জিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কাঠামো মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুপযোগী। সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন-সঞ্চালন-বিতরণ সামর্থ্য বৃদ্ধির যথার্থতা নিরূপণের লক্ষ্যে অংশীজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করার প্রস্তাব এবং এনএলডিসির বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির অভিযোগ অনুরূপ কমিটি দ্বারা তদন্তের জন্য প্রস্তাব করা হলেও সেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

৩৯. বিদ্যুৎ, কয়লা, গ্যাস ও তেল খাতে উদ্বৃত্ত কমবেশি ৭০ হাজার কোটি টাকা মজুদ আছে। তা ছাড়া ভোক্তার জামানতও সব খাত মিলিয়ে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি। এসব অর্থ না জমিয়ে জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্য যদি নিয়ন্ত্রণে যদি একটি যথাযথ তহবিলের অধীনে কাজে লাগানো যেত, তাহলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যেত, ভোক্তাও সুবিধা মতো।

৪০. রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে সার্বিকভাবে মুনাফা দেওয়া হয়েছে ১৮ শতাংশ, পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রে মুনাফা হয়েছে ১৬ শতাংশ। যেখানে বিইআরসি নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড মুনাফা ৪ দশমিক ১৮ শতাংশ। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ও বর্ধিত মুনাফা সমন্বয় করতে গিয়ে দাম বৃদ্ধির প্রস্তার আনা হয়। ২০২২ সালে দেখা যায়, ২৪ বা ২৬ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি সমন্বয়ের জন্য দাম বৃদ্ধির প্রস্তার দেয়া হয়েছে। অথচ শুনানিতে প্রমাণ হলো, কস্ট রেশনালাইজ করা হলে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা বাঁচানো যায়।

৪১. লুণ্ঠনমূলক ব্যয় বৃদ্ধির চিত্র বরাবরাই প্রমাণিত হয় গণশুনানিতে। দেখা যায়, পাওয়ার প্ল্যান্ট, ট্রান্সমিশন লাইন, ডিস্ট্রিবিউশন লাইনসহ সবক্ষেত্রে যৌক্তিক ব্যয়ের চেয়ে ২ থেকে ৩ গুণ বেশি ব্যয় করা হয়েছে। যেখানে ৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকা লাগে, সেখানে ২৫০ কোটি টাকা খরচ করে গ্যাসকূপ খনন করা হয়েছে। যেখানে ট্রান্সমিশন লাইন তৈরি করতে ১০০ কোটি টাকা লাগে, সেখানে ২০০ থেকে ২৫০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

৪২. বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিউবো'র) ২০১৭ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সামিট মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের মেঘনাঘাটের ৩০৫ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিউবো ১৮ টাকা মূল্যহারে ডিজেল থেকে উৎপাদিত ১০১ কোটি ৪৭ লাখ ১০ হাজার ১৩৫ ইউনিট বিদ্যুৎ ক্রয় করে। তাতে বিউবোর খরচ হয় ১ হাজার ৮২৬ কোটি ৪৭ লাখ ৮২ হাজার ৪৩০ টাকা। অথচ মূল চুক্তিমতে ওই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে গ্যাস কিংবা ফার্নেস অয়েল থেকে। ফার্নেস অয়েল থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের গড় মূল্যহার ৮ টাকা ধরা যায়। যদি ওই বিদ্যুৎকেন্দ্রে ফার্নেস অয়েল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো, তাহলে বিউবোর খরচ হতো ৮১১ কোটি ৭৬ লাখ ৮১ হাজার টাকা। ফলে ধরা যায় ওই অর্থবছরে বাড়তি ব্যয় হয় ১ হাজার ১৪ কোটি ৭১ লাখ ১ হাজার ৩৫০ টাকা। এরকম লোকসান বিউবোকে এর আগে ও পরের বছরগুলোতেও গুণতে হয়েছে। তবে সামিট যে জ্বালানি পরিবর্তন করে চুক্তির বরখেলাপ করেছে এবং বাড়তি ব্যয়ের বোঝা তৈরি করেছে, এজন্য কেউ তাদের দায়ী করেনি। এই অর্থ ভোক্তাদেরই পরিশোধ করতে হয়েছে।

৪৩. বিইআরসি আইন অনুযায়ী, লাইসেন্সির সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে গৃহীত স্কিম অনুমোদনের একক এখতিয়ার বিইআরসির। অথচ জিটিসিএল কর্তৃক গৃহীত কোনো স্কিম/প্রকল্পে বিইআরসির কোনো অনুমোদন নেই। তাদের এমন প্রকল্পের ফলে সঞ্চালন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা মূল্যহার বৃদ্ধির কারণ হয়েছে।

৪৪. প্রতিটি বিতরণ কোম্পানির ব্যয় অপেক্ষা আয় এত বেশি যে প্রত্যেকেরই রাজস্ব উদ্বৃত্ত থাকে। তারপরও তাদের দাবির প্রেক্ষিতে বিতরণ চার্জ নতুন করে বাড়ানো হয়। হিসাব অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে বিতরণে উদ্বৃত্ত আয় ও সব চার্জ

মিলিয়ে উদ্বৃত্ত রাজস্ব ১ হাজার ৬০৯ কোটি ৬৬ লাখ টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ হাজার ৬৩৮ কোটি ৭৮ লাখ টাকা।

৪৫. দেখা গেছে, সরকরি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তিতাসে অবৈধ গ্যাস সংযোগ চলছে। মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের কাছ থেকে মাসে ৭৭ ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য নেয়া হয়, দেয়া হয় গড়ে ৪০ ঘনমিটারেরও কম। উদ্বৃত্ত গ্যাস একদিকে তছরুপ হয়, অন্যদিকে ভোক্তা প্রতারিত হন।

৪৬. ২০১৯ সালের গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির আদেশে দেখা যায়, প্রতি হাজার ঘনফুট এলএনজির গড় ক্রয়মূল্য ধরা হয়েছে ৯.১৪৯৫ ডলার। সে সময় ভারতে ক্রয়মূল্য ছিল প্রায় ৬ ডলার। অতীতে জ্বালানি তেল ক্রয়ের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এলএনজি ক্রয় প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত মূল্য প্রদর্শনের অভিযোগ রয়েছে।

৪৭. সিস্টেম লস সুবিধা দিয়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে গ্যাস চুরি ও পরিমাপে কারচুপিকে সুরক্ষা দেয়া হয়। চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে অস্বাভাবিক মূল্যে লাইসেন্সিরা সম্পদ অর্জন করে এবং সে সম্পদ স্বল্প ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত থাকলেও তা মূল্যহারে সমন্বয় হয়। ফলে মূল্যহার লুণ্ঠনমূলক বলে বিবেচিত এবং ভোক্তারা অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিষয়টি প্রবিধানের অজুহাতে বজায় রাখা হচ্ছে, যা অন্যায় ও অগ্রহণযোগ্য।

গবেষণার সীমাব্ধতা

উপরোক্ত গবেষণায় ২০০৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এ যাবৎকালে প্রণীত জ্বালানি খাতের সকল আইন, নীতি ও বিধিমালা আমলে নেয়া গেলে পুরো খাতের একটি চিত্র তুলে আনা যেত। গবেষণাটি স্বল্প সময়ে স্বল্প লোকবলের মাধ্যমে চালিত বিধায় এর পরিসর সংকীর্ণ রয়ে গেছে। পর্যাপ্ত সময় ও লোকবল পাওয়া গেলে এ খাতের পেশাজীবী, বিশেষজ্ঞ ও আইনবিদদের মতামতের সমন্বয়ে এটিকে পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব হতো। এ গবেষণার আওতায় পড়ে এবং এর ধারাবাহিকতায় এমন আরো কিছু বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ রয়েছে। যার মধ্যে পড়ে-

১. **দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে জ্বালানি খাতে সংস্কার চলছে। তাতে এ খাতের নির্বাহী, আইনি ও রেগুলেটরি ব্যবস্থায় কী ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি হয়েছে, এর ফলে সুশাসনের উপাদানগুলো কতটা সমৃদ্ধ হয়েছে– তার মূল্যায়ন।**
২. **বিইআরসির আদেশসমূহের মধ্যে কী কী পালিত হয়েছে বা হয়নি– তার তালিকা প্রণয়ন।**
৩. **বিইআরসির আদেশ পালনে ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে দায় কার এবং তাতে বিইআরসির ভূমিকা কী দেখা গেছে– তার মূল্যায়ন।**
৪. **বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে মন্ত্রণালয়সহ আপস্ট্রিম বডিসমূহ ও রেগুলেটরির ভূমিকার মধ্যে দ্বন্দ্ব কোথায় এবং তা নিরসনের পথ কী?**
৫. **জ্বালানি খাতে গত এক দশকে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ এবং ভোক্তার কাছ থেকে আহরিত অর্থের বিলি-বণ্টন কীভাবে হয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি কোম্পানি ও উদ্যোক্তার পকেটে কত গেছে, উন্নয়ন ব্যয় কত হয়েছে, অনুন্নয়ন ব্যয় কত হয়েছে– তার সবিস্তার চিত্র প্রণয়ন।**

জ্বালানি খাতে স্বাধীনতা উত্তরকালে, কিংবা অন্ততপক্ষে ১৯৯০-এর দশকের পরবর্তীকালে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে মূল্যায়নের জন্য, আইন, নীতি, বিধিমালা ও আদেশের পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান প্রণয়নে বর্ধিত কলেবরে গবেষণা প্রয়োজন।

উপসংহার

আলোচ্য গবেষণায় ২০০৯ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে প্রণীত আইন, নীতি ও বিধিসমূহের বিস্তারিত পর্যালোচনা উঠে এসছে। তাতে দেখা গেছে, বিদ্যমান আইন, নীীত ও বিধিসমূহ ভোক্তাস্বার্থবান্ধব নয়। আইনে ভোক্তাবান্ধব যেসব উপাদান রয়েছে, তা কার্যকরণে সরকারের অনীহা সুস্পষ্ট। ধাপে ধাপে সরকারের পদক্ষেপের ম্যাধমে আইনগুলো আরো বেশি পরিমাণে ভোক্তাস্বার্থের প্রতিকূল হয়ে উঠেছে। যেসব ক্ষেত্রে সংশোধনের জন্য ভোক্তাদের দাবি ছিল, সেগুলো উপেক্ষিত হয়েছে। উল্টো দিক থেকে ভোক্তার স্বার্থ নতুন করে হরণ করার মতো ধারা আইন ও বিধিতে যুক্ত হয়েছে। বিইআরসি নিজে তার ভূমিকা পালনে আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যথেষ্ট সাহসী ভূমিকা সব সময় নিতে পারেনি। ফলে লুণ্ঠনমূলক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে নিয়ম করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিইআরসি দর্শকের ভূমিকায় থেকেছে। সরকার ও লাইসেন্সিদের দ্বারা আইনের লঙ্ঘন ঘটলেও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। উপরন্তু বিইআরসি নিজেও বিইআরসি আইন লঙ্ঘন করেছে। যা সরকার ও অন্যদের আইন লঙ্ঘনে আরো সাহসী করে তুলেছে। এ খাতের আইনসমূহ ভোক্তাবান্ধব করে গড়ে তুলতে এবং এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের নীতি পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি জরুরি।

গবেষণা ও পর্যালোচনা: আনিস রায়হান
গবেষণা উপস্থাপন: ১১ ডিসেম্বর ২০২২